

Parapar by Humayun Ahmed



পারাপার

হুমায়ূন আহমেদ



কাল সারারাত ঘুম হয় নি।

ঘুম না হবার কোনো কারণ ছিল না। কারণ ছাড়াই এই পৃথিবীতে অনেক কিছু ঘটে। দিনের আলো ফোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে ঘুমোতে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে চোখভর্তি ঘুম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। ঘুম ভাঙল স্বপ্ন দেখে। আমার বাবাকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমার গা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলছেন, এই হিমু, হিমু, ওঠ। তাড়াতাড়ি ওঠ। ভূমিকম্প হচ্ছে। ধরণী কাঁপছে।

আমি ঘুমের মধ্যেই বললাম, আহ, কেন বিরক্ত করছ ?

বাবা ভরাট গলায় বললেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো মজার ব্যাপার আর হয় না। ভেরি ইন্টারেস্টিং। এই সময় চোখকান খোলা রাখতে হয়। তুই বেকুবের মতো শুয়ে আছিস।

ঘুমোতে দাও বাবা।

তোর ঘুমোলে চলবে না। মহাপুরুষদের সবকিছু জয় করতে হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘুম। ঘুম হচ্ছে দ্বিতীয় মৃত্যু। সাধারণ মানুষ ঘুমায়— অসাধারণরা জেগে থাকে।...

ঢাকা শহরে ঘুঘুর ডাক শোনার কথা না।

কেউ কোনোদিন শুনেছে বলেও শুনি নি। ঘুঘু শহর পছন্দ করে না, লোকজন পছন্দ করে না। তাদের পছন্দ গ্রামের শান্ত দুপুর। তারপরেও কী যে হয়েছে— আমি ঘুঘুর ডাক শুনছি। বাংলাবাজার যাচ্ছিলাম, গুলিস্তানে ট্রাফিক জ্যামে পড়লাম। রিকশা, টেম্পো, বাস, ঠেলাগাড়ি সবকিছু মিলিয়ে দেখতে দেখতে জট পাকিয়ে গেল। এক্কেবারে কঠিন গিট্টু। হতাশ হয়ে রিকশায় বসে আছি আর ভাবছি— আধুনিক মানুষের একজোড়া পাখা থাকলে ভালো হতো। জটিল ট্রাফিক জ্যামের সময় তারা উড়ে যেতে পারত। ঠিক এই রকম হতাশা-জর্জরিত সময়ে ঘুঘু পাখির ডাক শুনলাম। সেই অতি পরিচিত শান্ত বিলম্বিত টানা-টানা সুর, যা শুনলে মুহূর্তের মধ্যে বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। মানুষের শরীরের ভেতরে যে আরেকটি শরীর আছে তার মধ্যে কাঁপন ধরে।

আমি হতচকিত ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক তাকালাম। এমন কি হতে পারে যে কেউ খাঁচায় করে পাখি নিয়ে যাচ্ছে, সেই পাখি ডেকে উঠল ? ইদানীং ঢাকার লোকদের পাখি-পোষা অভ্যাসে ধরেছে। নীলক্ষেতে বিরাট পাখির বাজার।

ট্রাফিক জট কমছে না। জট কমানোর চেষ্টাও কেউ করছে না। রোগা ধরনের এক ট্রাফিক পুলিশ দূরে দাঁড়িয়ে বাদামওয়ালার সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। এখানে যে কঠিন অবস্থা তা সে জানে বলেও মনে হচ্ছে না। এই তো দেখি সে বাদাম কিনছে। এক ঠোঙা বাদাম, একটু ঝাল লবণ।

যতই সময় যাচ্ছে অবস্থা জটিল হয়ে আসছে। সবাই কিন্তু নির্বিকার— 'যা হবার হোক' এমন এক ভঙ্গি। কারো মধ্যেই কোনো অস্থিরতা নেই। আমার রিকশা ঘেঁসে একটা মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে। মাইক্রোবাসের পর্দা টেনে দেয়া। ভেতরের যাত্রীদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মাইক্রোবাসের ড্রাইভারকে শুধু দেখছি। মনে হলো সে খুব মজা পাচ্ছে। একবার সে উঁচু গলায় বলল, লাগছে গিট্টু।

চড়চড় করে রোদ বাড়ছে। আশ্বিন মাসে খুব ঝাঁজালো রোদ ওঠে। বাতাস থাকে মধুর। আজ বাতাস নেই, শুধুই রোদ। রোদের সঙ্গে ঘামের গন্ধ, ঘামের গন্ধের সঙ্গে পেট্রোলের গন্ধ, পেট্রোলের গন্ধের সঙ্গে ঘুঘুর ডাক ঘু-ঘু-ঘু। মিলছে না একেবারেই মিলছে না। Something is wrong. আমি রিকশাওয়ালাকে বললাম, পাখি ডাকছে নাকি ?

আমার রিকশাওয়ালা বিরক্তমুখে আমার দিকে তাকাল। অর্থাৎ ঘুঘু ডাকছে না। কিংবা ডাকলেও সে শুনছে না। সবাই সবকিছু শুনতে পায় না। তাছাড়া রাস্তায় যারা জীবনযাপন করে গাড়ির হর্ন শুনতে শুনতে তাদের কান নষ্ট হয়ে যায়।

মাইক্রোবাসের পর্দা সরে গেল। একজন পান-খাওয়া মহিলা চোখ বড় বড় করে আমাকে দেখছেন। ভদ্রমহিলার সিঁথির চুল পাকা। এছাড়া তাঁর মুখে বয়সের কোনো চিহ্ন নেই। চুল পাকা না থাকলে অনায়াসে তাঁকে ৩০/৩২ বছরের তরুণী বলে চালানো যেত'। তিনি জানালার পর্দা সরিয়েছেন পানের পিক ফেলার জন্যে। অনেকখানি মাথা বের করে একগাদা পানের পিক ফেলে হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই হিমু না ?

আমি জবাব দিলাম না, কারণ ভদ্রমহিলাকে আমি চিনতে পারছি না। আমার অতি দূরের কোনো আত্মীয় হবেন। মেয়েরা অতি দূরের আত্মীয়কে কাছের মানুষ প্রমাণ করার জন্যে চট করে তুই বলে।

কী রে, কথা বলছিস না কেন ? তুই কি হিমু ?

হ্যাঁ।

আমাকে চিনতে পারছিস ?

না।

আমি আলেয়া খালা। এখন চিনেছিস ?

আলেয়া নামে কাউকে চিনি বলে মনে পড়ল না। একজন আলেয়াকেই চিনতাম, সে *সিরাজউদ্দৌলা* নাটকের নর্তকী। সিরাজউদ্দৌলা পলাশীর আম্রকাননে তাঁর বিখ্যাত যুদ্ধ যাত্রার আগে আলেয়ার কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলেন, আলেয়া তখন গান ধরল— 'পথহারা পাখি, কেঁদে ফিরে একা'।

হিমু, তুই এখানে কী করছিস ?

রিকশার সিটের উপর বসে আছি।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। যাচ্ছিস কোথায় ?

যখন রিকশায় উঠেছিলাম, তখন একটা গন্তব্য ছিল। এখন নিজেও ভুলে গেছি।

আমার সঙ্গে ফাজলামি করছিস কেন ? আমি তোর খালা না ? আয়, উঠে আয়।

কোথায় উঠে আসব ?

বাসে উঠে আয়। গরমে সিদ্ধ হবি না কি ? তুই যেখানে যাবি, নামিয়ে দেব। রিকশা ভাড়া মিটিয়ে উঠে আয়।

আমি কথা বাড়ালাম না। রিকশাওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে মাইক্রোবাসে উঠে পড়লাম। রিকশাওয়ালাকে দেখে মনে হলো, সে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করছে। অপমানিত বোধ করারই কথা, তার রিকশাকে ছোট করা হয়েছে।

মাইক্রোবাসে ঢুকে মনে হলো— ছোটখাটো একটা চলন্ত বেহেশতে ঢুকে পড়েছি। এয়ারকন্ডিশান্ড গাড়ি, এয়ারকন্ডিশনার চালু আছে। শীত-শীত ভাব। মাইক্রোবাসটার ছাদের একটা অংশ কাচের। ভেতরে বসে আকাশ দেখা যাচ্ছে। ছয়জনের বসার জায়গা। প্রতিটি সিট আলাদা। সিটগুলো ঘূর্ণায়মান। যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে ঘুরানো যায়। ভদ্রমহিলা একা যাচ্ছেন না। তাঁর সঙ্গে তাঁর মেয়ে, চেহারা দেখে সে রকমই মনে হচ্ছে, তবে চেহারা পুরো দেখা যাচ্ছে না, গাঢ় সানগ্লাসে মুখের পুরোটাই প্রায় ঢাকা। মেয়েটির কোলের উপর একটা বই। সানগ্লাস পরে এর আগে আমি কাউকে পড়তে দেখি নি। ভদ্রমহিলা তাঁর মেয়ের দিকে তাকিয়ে আগ্রহ নিয়ে বললেন, ও খুকি, এ হচ্ছে হিমু। খুব ভালো হাত দেখতে পারে। হাত দেখাবি ?

খুকি কোনোরকম উৎসাহ দেখানো দূরে থাকুক, বই থেকে চোখ পর্যন্ত তুলল না। এটা বড় ধরনের অভদ্রতা। তবে রূপবতীদের সব অভদ্রতা ক্ষমা করা যায়। এরা অভদ্র হবে এটাই স্বাভাবিক। এরা ভদ্র হলে অস্বস্তি লাগে।

কী রে খুকি, হাত দেখাবি ? বসেই তো আছিস। দেখা না। হিমু চট করে দেখে ফেলবে।

খুকি বরফশীতল গলায় বলল, কেন বিরক্ত করছ ?

আলেয়া খালা নিজের হাত বাড়িয়ে বললেন, হিমু, আমার হাতটা দেখে দে তো। মন দিয়ে দেখবি।

খুকি চোখ তুলে এক পলকের জন্যে মার মুখ দেখে আবার বই পড়তে শুরু করল। এই এক পলকের দৃষ্টিতেই তার মার ভস্ম হয়ে যাবার কথা। কালো চশমার কারণে হয়তো ভস্ম হলেন না।

আমি বললাম, খালা, আমি হাত দেখা ছেড়ে দিয়েছি।

সে কী!

মিথ্যা বানিয়ে বানিয়ে বলতাম। মিথ্যা বলতে বলতে এক সময় নিজের উপর ঘেন্না ধরে গেল। তারপর ঠিক করলাম, আর না, যথেষ্ট হয়েছে।

বাজে কথা রেখে হাতটা দেখ তো।

আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুই হাতের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললাম, আপনার সামনে একটা ভয়াবহ দুর্যোগ। পারিবারিক সমস্যা। অসম বিবাহঘটিত সমস্যা।

ভদ্রমহিলা তাঁর মেয়ের দিকে তাকালেন। ভদ্রমহিলার চোখের দৃষ্টি বলে দিচ্ছে, এই তো হয়েছে। মেয়ের দিকে তাকানোর অর্থ হচ্ছে, মেয়েকে ইশারায় বলা— কী, বলেছিলাম না ভালো হাত দেখে। দেখলি তো? হাতেনাতে প্রমাণ।

আমি বললাম, দুর্যোগ হঠাৎ উপস্থিত হয়েছে।

ভদ্রমহিলা বললেন, হঠাৎ মানে কবে?

ধরুন এক মাস। তবে দুর্যোগ আপনারা সামলাতে পারছেন না। আরো জটিল করে ফেলছেন।

ভদ্রমহিলা আবারো মেয়ের দিকে তাকালেন। চোখের ইশারায় আবারো বললেন, দেখলি কত বড় পামিস্ট?

মেয়েটি হাতের বই মুড়ে রাখল। চোখ থেকে চশমা খুলে ফেলে পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। আমি নিঃসন্দেহে হলাম, এই মেয়ে, মানুষ না। এ হলো হুর। এদের শুধু বেহেশতেই পাওয়া যায়। এরা বেহেশতের সঙ্গিনী।

And there will be companions
With beautiful, big
And lustrous eyes.

এই মেয়েটির চোখ— big, beautiful and lustrous. আমি ভাবলাম, মেয়েটা কিছু বলবে বোধহয়— ভঙ্গিটা সে রকম। সে শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। আবার কালো চশমা পরল, বই পড়তে শুরু করল। এটা কি বিশেষ কোনো বই যা সানগ্লাস ছাড়া পড়া যায় না?

আলেয়া খালা বললেন, এই সমস্যাটা কখন মিটবে?

মিটবে না।

তিনি হাহাকার করে উঠলেন, কী বলছিস তুই! মিটবে না মানে?

আমি নির্বিকার ভঙ্গিতে বললাম, এই সমস্যা মেটার নয়। সমস্যা বাড়তে বাড়তে এক্সপ্লোশান লিমিটে চলে আসবে। এই সমস্যায় একটি বাচ্চা মেয়ে জড়িত। মেয়েটির মৃত্যুযোগ আছে। সে মারা গেলে হয়তোবা সমস্যা মিটে যাবে।

আলেয়া খালা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

সানগ্লাস পরা বেহেশতের পরী এতক্ষণে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এইসব তথ্য আপনি আমার মার হাতে লেখা দেখতে পেলেন?

জি না। আমি বলেছি ইনটুশন থেকে। আমার ইনটুশন প্রবল। যে মেয়েটির কথা বললাম সে বোধহয় আপনার মেয়ে?

খুকি জবাব দিল না।

মাইক্রোবাস নড়ে উঠল। জ্যাম কমেছে। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। গাড়ির সামনে একটা ঠেলাগাড়ি আছে বলে গাড়িটাকে শম্বুক গতিতে এগুতে হচ্ছে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, যাই।

ভদ্রমহিলা তখনো নিজেকে সামলাতে পারেন নি। আমি যে চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছি তাও বোধহয় বুঝতে পারেন নি। মাইক্রোবাসের স্লাইডিং দরজা খোলার পর তিনি সংবিত ফিরে পেলেন। তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, না না, তুমি যেতে পারবে না।

এতক্ষণ আমাকে তুই বলছিলেন, শেষ সময়ে তুমি। ততক্ষণে আমি নেমে গেছি। মাইক্রোবাসের জানালার কাচ সরিয়ে ভদ্রমহিলা ব্যাকুল হয়ে ডাকছেন, এই হিমু! এই, এই! এই ছেলে! আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে অভয়দানের হাসি হাসলাম— অর্থাৎ আসব। আবার দেখা হবে।

ভদ্রমহিলাকে আমি চিনতে পারছি না। এই সমস্যাটা আমার ইদানীংকালে হচ্ছে। মানুষ না-চেনা রোগ। মস্তিষ্কের যে অংশে স্মৃতি জমা থাকে সেই অংশে কিছু বোধহয় হয়েছে। স্মৃতির ফাইল গায়েব হয়ে গেছে। এক সময়কার চেনা লোকজনদের সঙ্গে দেখা হয়। যেহেতু ব্রেইন সেলে জমা রাখা তাদের ফাইল গায়েব হয়ে গেছে, সেহেতু তাদের চিনতে পারি না। একজন নিওরোলজিস্টের সঙ্গে দেখা করা দরকার। রোগ আরো বাড়বার আগেই চিকিৎসা দরকার, নয়তো দেখা যাবে কাউকেই চিনতে পারছি না। সবাই অপরিচিত। অবশ্যি আমার ধারণা, সেই অভিজ্ঞতাও মজার অভিজ্ঞতা হবে। ৬০০ কোটি মানুষের বিশাল পৃথিবী, আমি কাউকেই চিনতে পারছি না।

মাইক্রোবাস থেকে বেকায়দা জায়গায় নেমেছি। সামনে পেছনে কোনো দিকেই যেতে পারছি না। দুদিকেই গাড়ির স্রোত। পথচারীকে রাস্তা পার হবার

সুযোগ করে দেবার জন্যে এদের কোনো মাথাব্যথা নেই। নিজে পৌঁছতে পারলেই হলো। আমাকে অপেক্ষা করতে হবে আরেকটা ট্রাফিক জ্যামের জন্যে। দেখা যাচ্ছে, ট্রাফিক জ্যামেরও একটা ভালো দিক আছে। এই সময়ে রাস্তা পারাপার করতে পারা যায়। To every cloud there is a silver lining.

আমি অপেক্ষা করছি। অপেক্ষা করতে খুব যে খারাপ লাগছে তা না। কারণ তেমন কোনো পরিকল্পনা নিয়ে বের হই নি। যাচ্ছি গেণ্ডারিয়ার দিকে। মোহাম্মদ ইয়াকুব আলি নামের এক ভদ্রলোক জরুরি তলব পাঠিয়েছেন। ভদ্রলোককে আমি চিনি না। তিনিও সম্ভবত আমাকে চেনেন না। তবে শুনেছি হুলস্থূল ধরনের বড় লোক। হেন ব্যবসা নেই যা তাঁর নেই। ইন্ডাস্ট্রি ফিন্ডাস্ট্রি দিয়ে যাকে বলে— 'ছেড়াবেড়া'। এমন একজন আমাকে জরুরি তলব পাঠাবেন কেন তাও বুঝতে পারছি না। জরুরি তলব পাঠালে ধীরে-সুস্থে যাবার নিয়ম। আমিও তাই করেছি। দু ঘণ্টা দেরি করেছি।

আবার ট্রাফিক জ্যাম লেগে গেছে। দুটা রিকশার পেছনের চাকা একটার সঙ্গে আরেকটা লেগে গেছে। দুজন রিকশাওয়ালাই দোষ কার তা নিয়ে তর্ক করছে, চাকা ছাড়াবার চেষ্টা করছে। জনতাও দুই ভাগ হয়ে গেছে। একদল খালি গা রিকশাওয়ালার পক্ষে অন্যদল দাড়িওয়ালা রিকশাওয়ালার পক্ষে। কাজেই জ্যাম। গাড়ি-টাড়ি বন্ধ করে ড্রাইভাররা সব গালে হাত দিয়ে বসে আছে।

আশ্বিন মাসের ঝাঁজালো রোদ ক্রমেই বাড়ছে। ঘুঘু পাখির ডাক আর শুনছি না।

আজকের দিনটা রহস্য দিয়ে শুরু হলো। পাখি রহস্য।



এ দেশের বিত্তবান সম্প্রদায় বাস করেন গুলশান, বনানী এবং বারিধারায়। এই প্রচলিত ধারণা ঠিক নয়। পুরনো ঢাকার গলি তস্য-গলি করতে করতে যেখানে এসে দাঁড়ালাম সেখানে দু-তিন বিঘার মতো জায়গা নিয়ে এক দুর্গ দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে জেলখানার মতো উঁচু এবং ভারি দেয়াল। দেয়ালের মাথায় কাঁটাতার। নিরেট লোহার গেট। সেই গেটে অনেকক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করেও লাভ হলো না। শব্দ ভেতরে যাচ্ছে না বলেই আমার ধারণা। কিংবা এ-ও হতে পারে যে, এ বাড়ির নিয়ম হচ্ছে ভেতর থেকে লোকজন বেরুতে পারে, বাইরের কেউ ঢুকতে পারে না। ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক।

আমি চলে যাবার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নেবার পরই ঘটাং ঘটাং শব্দ হতে লাগল। যেন কয়লার ইনজিনের শান্টিং হচ্ছে। তারপরেই ঘরঘর শব্দ। গেট খুলে গেল— সুতার মতো সরু একজন লুঙ্গিপরা, খালি গায়ের লোকের মাথা বের হয়ে এলো।

কাহারে চান ?

এ রকম দুর্বল স্বাস্থ্যের একজন লোককে দারোয়ানের চাকরি কেন দেয়া হলো তাই ভাবছি। আমি কাকে চাই সেটা বলা এখন আর তেমন জরুরি বলে মনে হচ্ছে না। তাছাড়া আমি কাউকেই চাই না। এ বাড়ির প্রধান ব্যক্তিটি আমাকে চান। লোকটা কারে চান না বলে কাহারে চান বলছে কেন ?

আফনে কাহারে চান ?

আমি হাসিমুখে বললাম, আমি কাহারেও চাই না। ইয়াকুব আলি সাহেব আমাকে চান।

আপনের নাম হিমু ?

হুঁ।

আপনি আসতে দেরি করছেন। আপনের আসার কথা দশটার সময়।

চলে যাব ?

আহেন, ভিতরে আহেন।

আমি ভেতরে ঢুকলাম। সঙ্গে সঙ্গে গেট বন্ধ হয়ে গেল। ঘটঘট শব্দে ভেতর থেকে দুটা তালা মেরে দেয়া হলো। তালার চাবি দারোয়ানের কোমরে বাঁধা। মনে হলো এই গেট আর খুলবে না। দারোয়ান বলল, ভিতরে চলে যান— বলেই সে খুপরিতে ঢুকে গেল। সেখানে একটা দড়ির ক্যাম্পখাটে তার বিছানা। সে অতি দ্রুত দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে পড়ল। এত দূর থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না কিন্তু আমি নিশ্চিত সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমি বিস্ময় নিয়ে দুর্গ প্রাচীরের ভেতর-বাড়ির দিকে তাকালাম। ইংল্যান্ড হলে এই বাড়িকে অনায়াসে ক্যাসেল বলে চালিয়ে দেয়া যেত। হুলস্থুল ব্যাপার। গ্রিক স্থাপত্যের বড় বড় কলামওয়ালা বাড়ি। টানা বারান্দার পুরোটাই মার্বেলের। বাড়ির সামনে ফোয়ারা আছে। ফোয়ারায় অবশ্যি পানি ঝরছে না তবে দেখে মনে হচ্ছে সচল ফোয়ারা। সময়ে সময়ে চালু করা হয়। গাড়ি-বারান্দায় চার-পাঁচজন মানুষ। এঁরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছেন। সবাইকে চিন্তিত মনে হচ্ছে। আমি খানিকটা এগুতেই ঝকঝকে চেহারার এক যুবক আমার দিকে আসতে শুরু করল। আমি থমকে দাঁড়ালাম। যুবকটির চেহারা সুন্দর, হাঁটার ভঙ্গি সুন্দর, হালকা ছাই-রঙা প্যান্টের উপর সে পরেছে আসমানি রঙের হাফ শার্ট। শার্টেও তাকে সুন্দর মানিয়েছে। মনে হচ্ছে অন্য কোনো রঙের শার্ট পরলে তাকে মানাত না। যার সব সুন্দর তার কথাবার্তা সাধারণত কর্কশ হয়। দেখা গেল, তার কথাবার্তাও সুন্দর। রেডিওতে অডিশন দিলে প্রথম সুযোগেই খবর পাঠের কাজ পেয়ে যেত।

আপনি কি হিমু সাহেব?

জি।

আপনার না দশটার দিকে আসার কথা?

গাড়ির জ্যামে আটকা পড়েছিলাম।

ও আচ্ছা। আপনি স্যারের কাছে চলে যান। উনি আপনার জন্যে অস্থির হয়েছেন।

ব্যাপারটা কী বলুন তো?

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, ব্যাপার আপনি জানেন না?

জি না।

বলেন কী! আমার ধারণা ছিল জানেন। যাই হোক, স্যারই আপনাকে বলবেন। দয়া করে স্যারের সঙ্গে কোনোরকম তর্ক বা আর্গুমেন্টে যাবেন না। উনি যা বলবেন, তাতেই হুঁ হুঁ বলে মাথা নাড়বেন। Be a yes-man. আসুন আপনাকে দেখিয়ে দি।

যাঁরা অপেক্ষা করছেন তাঁরা সবাই তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। বুঝতে পারছি, এখানে আমি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। শুধু ইয়াকুব আলি সাহেব একা না, এরা সবাই অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।

ইয়াকুব আলি সাহেব অসুস্থ— এ খবরও জানা ছিল না। যে ভদ্রলোক আমাকে খবর দিয়েছেন তিনি ইয়াকুব আলি সাহেবের অসুস্থতার খবর আমাকে দেন নি। অসুখ তেমন গুরুতর বলেও মনে হচ্ছে না। বিত্তবানরা গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় দেশে থাকেন না। সিঙ্গাপুর, ব্যাংককে থাকেন। তাঁদের কপালে দেশের মাটিতে মৃত্যু লেখা থাকে না। তাঁদের মৃত্যু অবধারিতভাবে হবে দেশের বাইরে।

হিমু সাহেব!

জি।

আপনি সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যান। সিঁড়ির সামনের প্রথম ঘরটাই স্যারের। দরজায় নক করলেই নার্স দরজা খুলে দেবে। আরেকটা কথা, কাঠের সিঁড়ি তো, আস্তে পা ফেলবেন। শব্দ হয় না যেন। সিঁড়িতে শব্দ হলে স্যার খুব বিরক্ত হন।

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললাম, আপনি এক কাজ করুন ভাই। আমাকে বরং কোলে করে দোতলায় দিয়ে আসুন। শব্দটব্দ একেবারেই যেন না হয় সেদিকে আপনি আমার চেয়ে ভালো লক্ষ রাখতে পারবেন।

ভদ্রলোক আমার কথায় আহত হলেন কি না বুঝতে পারলাম না। তাঁর মুখভঙ্গিতে কোনোরকম পরিবর্ত এলো না। আগে যেমন ছিল, এখনো সে রকম আছে। আমি তাঁর নির্বিকার ভঙ্গিতে মুগ্ধ হয়ে বললাম, ব্রাদার, আপনার নাম ?

আমার নাম মইন। মইন খান। আমাকে ব্রাদার বলবেন না। যান, আপনি দোতলায় যান। শব্দ করেই যান।

কাঠের সিঁড়ি হলেও সিঁড়িতে কার্পেট দেয়া। চেষ্টা করেও শব্দ করা গেল না।

দরজায় টোকা দেবার আগেই নার্স দরজা খুলে দিয়ে বলল, আসুন। স্যার জেগেই আছেন। সোজা চলে যান। জুতা খুলে এখানে রেখে যান। আপনার পা দেখি ধুলোভর্তি। এক কাজ করুন, বাথরুমে ঢুকে পা ধুয়ে ফেলুন।

শুধু পা ধোব, না ওযু করে ফেলব ?

নার্স কঠিন চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। এ বোধহয় মইন খানের মতো রসিকতায় স্থির থাকতে পারে না। তবে নার্সের চেহারা সুন্দর। কঠিন চোখে

তাকালেও তাকে খারাপ লাগছে না। বরং মনে হচ্ছে কঠিন চোখে না তাকালেই তাকে খারাপ লাগত। আমি উৎসাহের সঙ্গে বললাম, সিস্টার, আপনার নাম জানতে পারি ?

আমার নাম দিয়ে কি আপনার প্রয়োজন আছে ?

জি আছে। আমি যখন অসুস্থ হব তখন সেবা করার জন্যে আপনাকে রাখব। কল দিলে আসবেন না ?

যান, বাথরুমে যান, কার্বলিক সাবান আছে। ভালোমতো হাতমুখ ধোবেন।

আমি বাথরুমে ঢুকে পড়লাম।

অনেকদিন আগে একটা ছবি দেখেছিলাম। ২০০১ স্পেস অডিসি। ছবির একটি দৃশ্যে বিশাল খাটে একজন বুড়ো মানুষ শুয়ে আছেন। বুড়োর চেহারা অনেকটা সম্রাট শাহজাহানের মতো। ঘরটা প্রকাণ্ড। প্রকাণ্ড ঘরের প্রকাণ্ড খাটে একজন রুগ্ন কৃশকায় মানুষ— দৃশ্যটা দেখামাত্র মনে চাপ সৃষ্টি হয়। ইয়াকুব আলি সাহেবের শোবার ঘরে ঢুকে স্পেস অডিসি ছবির কথা মনে পড়ল। ইয়াকুব আলি সাহেব শুয়ে ছিলেন। আমাকে দেখে উঠে বসলেন। হাত ইশারায় কাছে ডাকলেন। তারপর দীর্ঘ সময় দুজনই চুপচাপ। উনি কিছু বলছেন না। আমিও না। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরের সাজসজ্জা দেখছি। খাটের পাশে বুক সেলফ। বুক সেলফের বইগুলোর নাম পড়ার চেষ্টা করছি। এত দূর থেকে পড়া যাচ্ছে না। ন্যাপথেলিন এবং অডিকোলনের মিশ্র গন্ধ নাকে আসছে। মোটেই ভালো লাগছে না। তাছাড়া বুড়ো ইয়াকুব সাহেবের চোখ দুটিতে পাখি পাখি ভাব। মানুষের পাখির মতো চোখ এই প্রথম দেখলাম।

হিমু!

জি।

বোস।

বসার জন্যে একটি মাত্র চেয়ার, সেটা ঘরের শেষপ্রান্তে। আমি কি সেখানে বসব না চেয়ার টেনে কাছে নিয়ে আসব তা বুঝতে পারছি না।

চেয়ার টেনে কাছে নিয়ে এসো। শব্দ হয় না যেন। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ সহ্য হয় না। এমন কি নিঃশ্বাস ফেলার শব্দও না।

চেয়ার পর্বতের মতো ভারি, আনতে গিয়ে আমার ঘাম বের হয়ে গেল। এরচে' মেঝেতে বসে পড়া ভালো ছিল।

হিমু!

জি স্যার।

তোমার সঙ্গে আমার আগে পরিচয় হয় নি। তবে তোমার কথা অনেক শুনেছি। তুমি নাকি সাধু-সন্ত টাইপের মানুষ। তোমার পেশা রাস্তায় ঘোরা। তোমার কিছু সাহায্য আমার দরকার।

স্যার বলুন কী করতে পারি।

ইয়াকুব আলি সাহেব খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। নার্স ঢুকল। মনে হয় কোনো একটা ওষুধ খাওয়াবার সময় হয়েছে। ইয়াকুব সাহেব চোখ না তুলেই হাতের ইশারায় নার্সকে চলে যেতে বললেন।

হিমু!

জি স্যার!

আমি কী চাই সেটা বললে তুমি আমাকে পাগল-টাগল ভাবতে পারো।

আপনি বলুন। আমি সহজে কাউকে পাগল ভাবি না।

তুমি সহজে পাগল ভাবো আর না ভাবো— আমাকে সাবধান হয়েই কথা বলতে হবে। আমি তোমার কাছে কী চাই সেটা বলার আগে তুমি আমার স্ত্রীর কথা শুনে নাও। আমার স্ত্রীর কথা শুনলে আমাকে আর পাগল ভাববে না।

বলুন।

মন দিয়ে শুনবে।

জি স্যার, মন দিয়ে শুনব।

ইয়াকুব আলি সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এলেন। তাঁর চোখের মণি জ্বলজ্বল করছে। মণির সাইজও ছোট। ভদ্রলোকের অসুখটা কী ? যক্ষ্মা ? যক্ষ্মা রোগীর চোখ জ্বলজ্বল করে বলে শুনেছি। যক্ষ্মা হলে ঘনঘন কাশার কথা। তিনি এখনো কাশছেন না।

আমার প্রথম স্ত্রী বিয়ের দু'বছরের মাথায় মারা যান। পরে আমি আবার বিবাহ করি। আমার প্রথম স্ত্রী গর্ভে কোনো সন্তানাদি হয় নি। আমার দ্বিতীয় স্ত্রীও প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান। আমি আবারো বিবাহ করি। সেই স্ত্রী জীবিত আছেন। আমার সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না বলে তিনি এখন আলাদা থাকেন। তুমি কি আমার কথা মন দিয়ে শুনছ ?

জি স্যার, শুনছি।

বলো দেখি, আমার প্রথম স্ত্রী বিয়ের কতদিন পর মারা যান ?

বিয়ের দু'বছরের মাথায়। বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

ইয়াকুব আলি সাহেব পাখির মতো চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর মুখ হাঁ হয়ে গেছে। ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। বিষ খাওয়ার ব্যাপারটি তিনি

বলেন নি। এটা আমি বানিয়ে বললাম। মনে হচ্ছে লেগে গেছে। আমার দু-একটা বানানো কথা খুব লেগে যায়। ইয়াকুব আলি সাহেব গলা পরিষ্কার করতে করতে বললেন, আমার স্ত্রী আত্মহত্যা করেন এই কথা তোমাকে বলি নি। তোমার জানার কথা না। কোথেকে জানলে ?

অনুমান করে বললাম। আমার অনুমান খুব ভালো।

তাই দেখছি। তোমার সম্পর্কে যা শুনেছি তা তাহলে মিথ্যা না। যাই হোক, আমার স্ত্রীর কথা বলি— তার নাম জয়নাব। সে আমার উপর মিথ্যা সন্দেহ করে আত্মহত্যা করে। মৃত্যুর পর সে তার ভুল বুঝতে পারে বলে আমার ধারণা। কারণ তারপরই সে নানানভাবে আমাকে সাহায্য করতে থাকে।

আমি বললাম, কীভাবে সাহায্য করেন ? বিপদ-আপদে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন কী করতে হবে বা না করতে হবে ?

হ্যাঁ। ঠিক ধরেছ। ব্যবসার আয়-উন্নতিও তার জন্যেই হয়েছে। তার উপদেশেই আমি ব্যবসা শুরু করি।

ব্যাপারটার অন্য ব্যাখ্যাও তো থাকতে পারে...

তুমি কী বলতে চাচ্ছ আমি বুঝতে পারছি। অন্য ব্যাখাও আমি জানি। অন্য ব্যাখা হলো— আমার অবচেতন মন আমাকে সাহায্য করছে। আমার মৃতা স্ত্রী আমার অবচেতন মনের কল্পনা।

আপনি এই ব্যাখ্যা বিশ্বাস করেন না ?

না।

অনেকক্ষণ কথা বলার জন্যেই সম্ভবত ইয়াকুব আলি সাহেব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি টেবিলের উপর রাখা রিমোট কনট্রোল নবে হাত রাখলেন। নার্স ছুটে এলো। তিনি বোধহয় সাইন ল্যাংগুয়েজে কিছু বললেন— নার্স মেজারিং গ্লাসের চেয়ে একটু বড় সাইজের গ্লাসে করে কী যেন নিয়ে এলো। তিনি এক চুমুক খেয়ে চোখ বন্ধ করে থাকলেন। যতক্ষণ তিনি চোখ বন্ধ করে থাকলেন ততক্ষণ নার্স কড়া চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। চোখের ইশারায় বলল, তুমি এই অসুস্থ মানুষটাকে কেন বিরক্ত করছ ? বের হয়ে যাও।

ইয়াকুব আলি সাহেব চোখ খুলে নার্সকে আবার ইশারা করলেন। নার্স চলে গেল। তিনি চাপা গলায় বললেন, হিমু!

জি।

আমি অসুস্থ। ভয়াবহভাবেই অসুস্থ। মৃত্যুর ঘন্টা ঢং ঢং করে বাজছে। তোমার তো অনুমান ভালো। বলো দেখি অসুখটা কী ?

বলতে পারছি না। আমার অনুমান সব সময় কাজ করে না।

কতদিন বাঁচব সেটা বলতে পারবে ?

জি না।

ইয়াকুব আলি সাহেব গলার স্বর আরো নামিয়ে ফেললেন। তাঁর কথা অস্পষ্ট হয়ে এলো। কথা বোঝার জন্যে আমাকে তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে হলো।

আমি শিশুদের একটা অসুখ বাধিয়ে বসেছি। এগুলো সাধারণত শিশুদের হয়। তখন তাদের বাঁচিয়ে রাখতে রক্ত বদলে দিতে হয়। কিছুদিন পর পর নতুন রক্ত। এখন কি অসুখটা বুঝতে পারছ ?

লিউকোমিয়া ?

হ্যাঁ লিউকোমিয়া। আমি প্রতি দশদিন পর পর শরীরে চার ব্যাগ করে রক্ত নিই। ডাক্তাররা বলছেন এই অসুখ থেকে উদ্ধারের কোনো আশা নেই। কিন্তু আমার স্ত্রী বলেছে উদ্ধারের আশা আছে। সে পথ দেখিয়ে দিয়েছে।

আপনার মৃতা স্ত্রী পথ দেখিয়ে দিয়েছেন ?

হুঁ।

পথটা কী ?

খুবই সহজ পথ, আবার এক অর্থে খুবই জটিল। তবে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে। এই জন্যেই তোমাকে খবর দিয়ে আনানো।

পথটা কী বলুন।

আমার স্ত্রী স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছে, সম্পূর্ণ নিষ্পাপ পূর্ণবয়স্ক মানুষের রক্ত যদি আমি শরীরে নিতে পারি তাহলে রোগ সেরে যাবে। ব্যাপারটা সহজ না ?

জি সহজ।

জটিল অংশটা কী জানো ? জটিল অংশ হলো— নিষ্পাপ মানুষ পাওয়া।

আপনাকে এখন নিষ্পাপ মানুষ ধরে ধরে তাদের শরীরের সব রক্ত বের করে নিতে হবে ?

তুমি রসিকতা করার চেষ্টা করবে না হিমু। Don't try to be funny. আমি মরতে বসেছি। যে মরতে বসে সে রসিকতা করে না। তুমি আমাকে নিষ্পাপ মানুষ যোগাড় করে দেবে।

নিষ্পাপ মানুষ বুঝব কী করে ?

সেটা তুমি জানো, আমি জানি না। আমি খরচ দেব। টাকা যা লাগে আমি দেব। Is it clear ?

স্যার, আপনার বয়স কত হয়েছে ?

নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না। আমার বাবা-মা জন্মের দিনক্ষণ লিখে রাখেন নি। আমাকে বলেও যান নি। তবে ৫৮/৫৯ হবে।

অনেকদিনই তো বাঁচলেন।

তুমি বলতে চাচ্ছ, অনেকদিন বেঁচেছি বলে আর বাঁচতে পারব না ? বেঁচে থাকার আমার অধিকার নেই ?

তা না।

স্পষ্ট করে বলো কী বলতে চাও।

আজ থাক। পরে বলব। আপনি ক্লান্ত। বিশ্রাম করুন।

আমি কি আশা করতে পারি তুমি নিষ্পাপ লোক খুঁজে বেড়াবে ?

জি। আমার কাছে ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং লাগছে। কাজেই খুঁজব।

তোমাকেও আমি খুশি করে দেব। I will make you happy. এমন খুশি করব যে চিন্তাও করতে পারবে না।

আমি স্যার এমনিতেই খুশি।

তোমাকে মোট বারদিন সময় দেয়া হলো। দুদিন পর আমি রক্ত নেব। যা পাওয়া যায় তাই নেব। তার দশদিন পর তোমার এনে দেয়া রক্ত নেব।

স্যার এখন উঠি ?

যাবার পথে আমার ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলবে। টাকা-পয়সার ব্যাপার আমি সরাসরি ডিল করি না। সে ডিল করে। ওর নাম মইন। মইন খান। ভালো ছেলে। খুব ভালো ছেলে।

নিষ্পাপ ?

ইয়াকুব আলি সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে হলো খানিকটা ধাঁধায় পড়ে গেলেন। আমি বের হয়ে এলাম। ম্যানেজার মইন সাহেবকে আমার খুঁজে বের করতে হলো না। তিনি সিঁড়ির গোড়াতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে সরাসরি অন্য একটা কামরায় নিয়ে গেলেন। এই কামরাটা মনে হচ্ছে ম্যানেজারের অফিসঘর। টেবিলে ফাইলপত্র সাজানো। মইন খান বসেছেন রিভলভিং চেয়ারে।

হিমু সাহেব, বসুন।

আমি বসলাম। মইন কৌতূহলী হয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হিমু সাহেব!

জি।

আপনাকে স্যার কী দায়িত্ব দিয়েছেন, তা আমি জানি। স্যারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। যদিও কোন ক্ষমতায় আপনি নিষ্পাপ লোক খুঁজে বের করবেন তা বুঝতে পারছি না।

আমি হাসলাম। আমার স্টকে অনেক ধরনের হাসি আছে। এর মধ্যে একটা ধরন হলো— মানুষকে পুরোপুরি বিভ্রান্ত করে দেয়া হাসি। মইন খান পুরোপুরি বিভ্রান্ত হলেন। তাঁর চোখমুখ শক্ত হয়ে গেল। তিনি শুকনো গলায় বললেন, আপনি কী করেন জানতে পারি কি ?

হাঁটাহাঁটি করি। আর কিছু না। আমি নগর পরিব্রাজক।

আপনি কি হেঁয়ালি ছাড়া সহজভাবে কথা বলতে পারেন না ?

সহজভাবেই বলছি।

ভদ্রলোক রেগে গেছেন। রাগ সামলে নিয়ে সহজভাবেই বললেন, এইখানে যে এসেছেন এতে আপনার সময় নষ্ট হয়েছে। আসা-যাওয়ার একটা খরচ আছে। খরচটা দিতে চাচ্ছি। কত দেব ?

আমি চুপ করে আছি। খরচ বলতে ছয় টাকা রিকশা ভাড়া দিয়েছি। ফিরব হেঁটে হেঁটে।

পাঁচ শ' টাকা দিলে কি আপনার চলবে ?

আমি হাসলাম। মইন খান একটা ভাউচার বের করে দিলেন। স্ট্যাম্প লাগানো ভাউচার। আমি সই করলাম। তিনি পাঁচ শ' টাকার একটা নোট বের করে দিলেন। ঝকঝকে নোট। মনে হচ্ছে এইমাত্র টাকশাল থেকে ছাপা হয়ে এসেছে।

এছাড়াও আপনার খরচ-পত্তর যা লাগে দেয়া হবে। কোন খাতে কত খরচ হলো— এটা জানিয়ে বিল করলেই খরচ দিয়ে দেয়া হবে। বুঝতে পারছেন ?

জি পারছি।

মইন সাহেবের টেবিলের উপর রাখা দুটি টেলিফোনের একটি বাজছে। তিনি তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে টেলিফোন ধরলেন। বোঝাই যাচ্ছে এটা বিশেষ টেলিফোন। বিশেষ বিশেষ লোকজনের জন্যে। হয়তো ইয়াকুব সাহেব করেছেন। আমি শুধু শুনছি মইন খান জি জি করছেন। অল্প খানিকক্ষণ জি জি করেই তাঁর ঘাম বেরিয়ে গেল বলে মনে হয়। তিনি টেলিফোন নামিয়ে সত্যি সত্যি রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি দয়া করে আপার সঙ্গে দেখা করে যাবেন।

কার সঙ্গে ?

আপার সঙ্গে। স্যারের মেয়ে।

উনার কি একটাই মেয়ে ?

হ্যাঁ এক মেয়ে। বাবার অবর্তমানে এই মেয়েই সব পাবে।

এইজন্যেই বুঝি তাঁর ভয়ে আপনি এত অস্থির ?

ম্যানেজার সাহেব অপমান গায়ে মাখলেন না। সব অপমান গায়ে মাখলে ম্যানেজারি করা যায় না। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, চলুন, উনার কাছে নিয়ে যাই।

উনার সঙ্গে কীভাবে কথা বলব না বলব সেই বিষয়ে কি আপনার কোনো ব্রিফিং আছে ?

না। যেভাবে ইচ্ছা কথা বলবেন। উনি থাকেন মিনেসোটায়। আর্কিটেকচারের ছাত্রী। বাবার অসুখের খবর শুনে এসেছেন।

বিয়ে করেছেন ?

বিয়ে করেছেন কি করেন নি সেটা জানার আপনার দরকার কী ?

দরকার আছে। বিবাহিত মেয়ের সাথে একভাবে কথা বলতে হয়, অবিবাহিত মেয়ের সাথে অন্যভাবে।

না, বিয়ে করেন নি। চলুন।

সূর্যের চেয়ে বালির উত্তাপ সব সময় বেশি। এই আপ্তবাক্য ইয়াকুব সাহেবের মেয়ের বেলায় খাটবে কি না বুঝতে পারছি না। মেয়েটি বাবার মতোই লম্বা। ধারালো চেহারা। সবেমাত্র গোসল করে এসেছে। বড় গোলাপি রঙের টাওয়েলে মাথা ঢাকা। কালো রঙের রোব পরেছে। বাঙালি মেয়েদের রোবে মানায় না। এই মেয়েটিকে মানিয়ে গেছে। অনেক দিন বিদেশে আছে বলেই হয়তো।

বসুন।

আমি বসলাম। তিনতলার বারান্দায় বেতের চেয়ার— টেবিল সাজানো। মেয়েটি বসল না। দাঁড়িয়ে রইল। চুল ভেজা নিয়ে মেয়েরা বোধহয় বসতে পারে না। রূপাকেও দেখেছি যতক্ষণ চুল ভেজা ততক্ষণই সে দাঁড়িয়ে।

শুনেছি, বাবা আপনার উপর একটা কঠিন দায়িত্ব দিয়েছেন।

একটা দায়িত্ব পেয়েছি। কঠিন কি না এখনো জানি না।

বাবা যে খুবই হাস্যকর একটা ব্যাপার করতে যাচ্ছেন সেটা কি আপনার মনে হচ্ছে না ?

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালে আমাদের মাথার ঠিক থাকে না। সেই সময় কোনো কিছুই হাস্যকর থাকে না।

খুবই সত্যি কথা। মৃত্যু ভয়াবহ ব্যাপার। এর মুখোমুখি হলে মাথা এলোমেলো হয়ে যাবারই কথা। কিন্তু অন্যদের কি উচিত সেই এলোমেলো মাথার সুযোগ গ্রহণ করা ?

আপনি আমার কথা বলছেন ?

জি, আপনার কথাই বলছি। সরি, আপনাকে সরাসরি কথাটা বললাম। আমি সরাসরি কথা বলি এবং আমি আশা করি আপনিও যা বলার সরাসরি বলবেন।

আমি হাসলাম। আমার সেই বিখ্যাত বিভ্রান্ত করা হাসি। তবে এই মেয়ে শক্ত মেয়ে। সে বিভ্রান্ত হলো না। শুধু তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো।

বাবা আপনার খোঁজ কোথায় পেয়েছেন বলুন তো ?

আমি জানি না।

জানার ইচ্ছাও হয় নি ?

জি না। আমার কৌতূহল কম।

আপনাকে নিষ্পাপ লোক খুঁজতে বলা হলো, আপনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন ?

আমি কাউকে না বলতে পারি না। আপনি যদি আমাকে কিছু করতে বলেন তাও হাসিমুখে করে দেব।

আপনাকে দিয়ে কোনো কিছু করানোর আগ্রহই আমার নেই। তবে ছোট্ট একটা বক্তৃতা দেয়ার আগ্রহ আছে। মন দিয়ে শুনুন।

জি, আমি মন দিয়েই শুনছি।

বড় রকমের বিপদে পড়লে মানুষ আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকে যায়। তখন শুরু হয় তন্ত্র, মন্ত্র, তাবিজ, ঝাড়ফুঁক। অর্থহীন সব ব্যাপার।

আপনি এইসব বিশ্বাস করেন না ?

কোনো বুদ্ধিমান মানুষই এইসব বিশ্বাস করে না। আমি নিজেকে একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে মনে করি।

কিছু কিছু ব্যাপার কিন্তু আছে। আমি অনেককেই দেখেছি ভবিষ্যৎ বলতে পারে।

ভবিষ্যৎ বলতে পারে এমন কাউকে আপনি দেখেন নি। আপনি হয়তো শুনেছেন। ভবিষ্যৎ এখনো ঘটে নি। যা ঘটে নি তা আপনি দেখবেন কী করে ?

করিম বলে একটা লোক আছে। সে হারানো মানুষ খুঁজে বেড়ায়। চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে থাকে। তারপর চোখ মেলে বলে দেয় হারানো মানুষটা কোথায় আছে। আমার নিজের চোখে দেখা। আপনি চাইলে আপনাকেও নিয়ে দেখাতে পারি।

প্লিজ, বাজে কথা বলবেন না।

আমি নিজেও মাঝে মাঝে ভবিষ্যৎ বলি।

I see. আমিও সে রকম ধারণা করেছিলাম। কী ধরনের ভবিষ্যৎ আপনি বলেন?

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, এক্ষুণি একটা ভবিষ্যতদ্বাণী করে যাই। আগামী এক-দুদিনের ভেতর ঢাকা শহরে একটা ভূমিকম্প হবে।

ভূমিকম্প?

জি ভূমিকম্প। বড় কিছু না, ছোটখাটো। সামান্য ঝাঁকুনি।

মেয়েটির মুখে একটা ধারালো হাসি তৈরি হতে হতে হলো না। আমি মেয়েটির সংযমের প্রশংসা করলাম। অন্য যে কেউ আমাকে কঠিন কথা শুনিয়ে দিত।

আজ উঠি, না আরো কিছু বলবেন?

না, আর কিছু বলব না।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। মেয়েটি আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল, আসুন আপনাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেই। গাড়ি আছে— গাড়ি আপনাকে পৌঁছে দেবে।

জি আচ্ছা। আপনার অনেক মেহেরবানি।

এসি বসানো স্টেশন ওয়াগন। ভেলভেটের নরম সিট কভার। এয়ারফ্রেশার আছে। গাড়ির ভেতরে মিষ্টি বকুল ফুলের গন্ধ। জানালায় কী সুন্দর পর্দা! গাড়ি যে চলছে তাও বোঝা যাচ্ছে না। আরামে ঘুম এসে যাচ্ছে। এক কাপ চা পাওয়া গেলে হতো। চা খেতে খেতে যাওয়া যেত। চা এবং চায়ের সঙ্গে সিগারেট। চা গাড়িতে নেই, তবে পাঞ্জাবির পকেটে সিগারেট আছে। আমি সিগারেটের জন্যে পকেটে হাত দিতেই গাড়ির ড্রাইভার বিরক্ত স্বরে বলল, গাড়ির মইধ্যে সিগ্রেট ধরাইবেন না। গাড়ি গান্ধা হইব।

আমি ড্রাইভারের কথা অগ্রাহ্য করলাম। পৃথিবীর সব কথা শুনতে নেই। কিছু কিছু কথা অগ্রাহ্য করতে হয়।

সিগ্রেট ফেলেন।

এ তো দেখি রীতিমতো ধমক। আশ্চর্য! গাড়ির ড্রাইভার আমাকে দেখেই বুঝে ফেলেছে আমি গাড়ি-চড়া মানুষ নই। রাস্তার মানুষ। আমাকে ধমকালে ক্ষতি নেই।

কী হইল, কথা কানে যায় না ? সিগ্রেট ফেলতে কইলাম না ?

আমি শান্তস্বরে বললাম, তুমি সাবধানে গাড়ি চালাও। বারবার পেছনে তাকিও না। অ্যাকসিডেন্ট হবে।

সিগ্রেট ফেলেন।

আমি সিগারেট ফেলে দিলে তোমার আরো ক্ষতি হবে। তখন তুমি আফসোস করবে। বলবে, হায় হায়, কেন সিগারেট ফেলতে বললাম!

ফেলেন সিগ্রেট।

আচ্ছা যাও, ফেলছি।

আমি সিগারেট ফেলে দিলাম। তবে ফেললাম আমার পাশের টকটকে লাল রঙের ভেলভেটের সিট কভারে। দেখতে দেখতে ভেলভেট পুড়তে শুরু করল। বিকট গন্ধ বেরুল।

হতভম্ব ড্রাইভার গাড়ি থামাল। সে দরজা খুলে বেরুতে বেরুতে সিটের অর্ধেকটা পুড়ে ছাই। ড্রাইভার বিস্মিত হয়ে তাকাচ্ছে। আমি তার দিকে তাকাচ্ছি হাসিমুখে। ড্রাইভার ক্লান্ত গলায় বলল, এইটা কী করলেন ?

আমি সহজ গলায় বললাম, মন খারাপ করবে না। এই পৃথিবীর সবই নশ্বর। একমাত্র পরম প্রকৃতিই অবিনশ্বর। তিনি ছাড়া সবই ধ্বংস হবে। ভেলভেটের সিট কভার অতি তুচ্ছ বিষয়। গাড়িটা এক সাইডে পার্ক করো। এসো, চা খাও। চা খেলে তোমার হতভম্ব ভাবটা দূর হবে।

ড্রাইভার আমার সঙ্গে চা খেতে এলো। তাকে এখন আর মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। বোধশক্তিহীন 'জম্বির' মতো দেখাচ্ছে।

ন-দশ বছরের একটা রোগা ছেলে ফ্লাস্কে চা নিয়ে বসে আছে। ছেলেটির পাশে তার ছোট দুই বোন। চা চাইতেই ছোট মেয়েটি হাসিমুখে দুটা কাপ ধুতে শুরু করল। বড় বোন সেই ধোয়া কাপ আবার নতুন করে ধুল। ভাই চা ঢালল। তিনজনের টি-স্টল।

ড্রাইভার চুকচুক করে চা খাচ্ছে। আড়ে আড়ে তাকাচ্ছে আমার দিকে। আমাকে বুঝতে চেষ্টা করছে। নিজেকে বোঝা নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আমাদের প্রধান চেষ্টা অন্যকে বোঝা।

চা কত হয়েছে রে ?

ছোট মেয়েটি হাসিমুখে বলল, দুই টেকা। আমি সদ্য পাওয়া চকচকে পাঁচ শ টাকার নোটটা তার হাতে দিলাম। সে আতঙ্কিত গলায় বলল, ভাংতি নাই।

আমি সহজস্বরে বললাম, ভাংতি দিতে হবে না, রেখে দাও। মেয়েটা যতটা না বিস্মিত হয়েছে ড্রাইভার তারচেয়েও বিস্মিত। তার মুখ হাঁ হয়ে গেছে। চোখে পলক পড়ছে না। আমি বললাম, ড্রাইভার, তুমি গাড়ি নিয়ে চলে যাও। আমি হেঁটে হেঁটে বাসায় ফিরব। সিট কভার পোড়া নিয়ে কেউ যদি কিছু বলে— আমার কথা বলবে।

ড্রাইভার কোনো কথা বলছে না। এখনো পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে। পলকহীন চোখে মানুষের তাকানো উচিত নয়। পলকহীন চোখে তাকায় সাপ আর মাছ। তাদের চোখের পাতা নেই। মানুষ সাপ নয়, মাছও নয়। তাকে পলক ফেলতে হয়।

আমি এগোচ্ছি। মনে মনে ভাবছি, এমন যদি হতো— ড্রাইভার তার গাড়ির কাছে ফিরে গিয়ে দেখে ভেলভেটের সিট কভার আগের মতোই আছে। সেখানে কোনো পোড়া দাগ নেই, তাহলে ড্রাইভারের মনোজগতে কী প্রচণ্ড পরিবর্তনই না হতো! কিন্তু তা সম্ভব নয়। আমি কোনো মহাপুরুষ নই। আমার কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নেই। আমি হিমু। অতি সাধারণ হিমু।

তবে অতি সাধারণ হিমু হলেও মাঝে মাঝে আমার কিছু কথা লেগে যায়। অন্যদেরও নিশ্চয়ই লাগে। অন্যরা লক্ষ করে না, আমি করি। ভূমিকম্পের কথা বলাটা অবশ্যি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। মনে এসেছে, বলে ফেলেছি।

দুপুরের খাওয়া হয় নি। খিদে জানান দিচ্ছে। আমি নিয়ম মেনে চলি না। কিন্তু আমার শরীর নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা। যথাসময়ে তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা হয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা জয় করার নিয়মকানুন জানা থাকলে হতো। বিজ্ঞান এই দুটি জিনিস জয় করার চেষ্টা কেন করছে না ? আমার চেনা একজন আছে যে তৃষ্ণা জয় করেছে। গত তিন বছরে সে এক ফোঁটা পানি খায় নি। তার নাম একলেমুর মিয়া। সে ফার্মগেটে তার মেয়েকে নিয়ে ভিক্ষা করে। আমার সঙ্গে ভালো খাতির আছে। আজ দুপুরের খাওয়া তার সঙ্গে খাওয়া যায়। বড় খালার বাড়িতেও যেতে পারি। কিংবা রূপাদের বাড়ি। তবে রূপার বাড়িতে থাকার সম্ভাবনা খুব কম। সে কী একটা বই লিখছে। সকালে উঠে তাদের জয়দেবপুরের বাড়িতে চলে যায়। রাতে ফেরে। সেখানে টেলিফোন নেই। ঢাকার বাসায় খোঁজ নিয়ে দেখা যেতে পারে।

চট করে কোনো এক দোকান থেকে টেলিফোন করা এখন আর আগের মতো সহজ নয়। টেলিফোন করতে টাকা লাগে। আগে যে-কোনো দোকানে ঢুকে করুণ মুখে বললেই হতো— ভাই, একটা টেলিফোন করব।

এখন টেলিফোনের কথা বলার আগে কাউন্টারে পাঁচটা টাকা রাখতে হয়।

বিনা টাকায় টেলিফোন করা যায় কি না সেই চেষ্টা করা যেতে পারে। নতুন কোনো টেকনিক বের করতে হবে। এমন টেকনিক যা আগে ব্যবহার করা হয় নি। ভিক্ষার জন্যে যেমন প্রতিনিয়ত নতুন নতুন টেকনিক বের করতে হয়— ফ্রি টেলিফোনের জন্যেও হয়। আমি এক টুকরো কাগজ নিয়ে লিখলাম—

ভাই,

আমার বান্ধবীকে খুব জরুরি একটা টেলিফোন করা দরকার। সঙ্গে টাকা-পয়সা নেই বলে লজ্জায় মুখ ফুটে বলতে পারছি না।

বিনীত

হিমু

কাগজের টুকরো হাতে নিয়ে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকে পড়লাম। সেলসম্যানকে কাগজটা পড়তে দিলাম। সে পড়ল, খানিকক্ষণ বিস্মিত চোখে আমাকে দেখে টেলিফোন সেট আমার দিকে এগিয়ে দিল।

হ্যালো, আমি হিমু।

চিনতে পারছি।

কেমন আছ রূপা ?

ভালো।

আজ জয়দেবপুর যাও নি ?

না, কিছুক্ষণের মধ্যে রওনা হব।

আচ্ছা, তোমাদের জয়দেবপুরের বাড়িটা কেমন ?

খুব সুন্দর বাড়ি।

কী রকম সুন্দর বলো তো ?

কেন ?

আহা বলো না।

বললে তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে ?

যেতে পারি।

সাত একর জমি নিয়ে গ্রামের ভেতর খামারবাড়ি কিংবা বলতে পারো খামার হাউস। বাড়ির পেছনে পুকুর আছে। পুকুর বড় না, ছোট্ট পুকুর। কিন্তু মার্বেল পাথরে বাঁধানো ঘাট। সেই ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে। বাড়িটা চারদিক দিয়ে গাছপালায় ঘেরা।

বাড়ির ছাদ আছে? ছাদে বসে জোছনা দেখা যায়?

ছাদে বসে জোছনা দেখার ব্যবস্থা নেই। টালির ছাদ।

বাংলো বাড়ি?

হ্যাঁ, বাংলো বাড়ি। যাবে আমার সঙ্গে?

ভাবছি।

তুমি কোথায় আছ বলো, আমি তোমাকে তুলে নিয়ে যাব।

আমি দ্রুত চিন্তা করছি। রূপার সঙ্গে নির্জন বাংলো বাড়িতে পুরো একটা দিন থাকার লোভ জয় করতে হবে। যে করেই হোক করতে হবে। শরীরের উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, কিন্তু মনের উপর তো আছে...

হ্যালো— বলো তুমি কোথায় আছ?

শোন রূপা। জরুরি কিছু খবর আমাকে এখন লোকজনদের দিয়ে বেড়াতে হবে। নয়তো যেতাম।

কী জরুরি খবর?

কাল-পরশুর মধ্যে ভূমিকম্প হবে— এই খবর। যদিও তা হবে ছোট সাইজের, তবুও তো ভূমিকম্প।

তুমি আমার সঙ্গে কোথাও যাবে না সেটা বলো— ভূমিকম্পের অজুহাত তৈরি করলে কেন?

অজুহাত না, সত্যি।

তুমি বলতে চাচ্ছ ভূমিকম্পের ব্যাপার তুমি আগে জেনে ফেলেছ?

হুঁ।

তোমার এই এই...

রূপা কথা পাচ্ছে না। রাগে তার চিন্তা এলোমেলো হয়ে গেছে।

আমি বললাম, টেলিফোন রাখি রূপা? এখন তোমাদের বাংলো বাড়িতে গিয়ে লাভ হবে না। দিন-তারিখ দেখে যেতে হবে— পূর্ণিমা দেখে। নেক্সট পূর্ণিমায় যাব। অবশ্যই যাব, রাখি কেমন?

আমি টেলিফোন নামিয়ে রেখে বের হয়ে এলাম। পাশের একটা দোকানে ঢুকলাম। কাগজের টুকরোটা কতটুকু কাজ করে দেখা দরকার। মনে হচ্ছে ভালো ব্যবস্থা।

এই দোকানটার সেলসম্যান কিংবা মালিক আগের দোকানটার মতো চট করে রিসিভার এগিয়ে দিলেন। ভুরু কুঁচকে কাগজটা দেখতে দেখতে বললেন, আপনি কথা বলতে পারেন না ?

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম।

কথা বলতে পারেন তাহলে কাগজে লিখে এনেছেন কেন ? এই ঢং করার দরকার কী ?

আমি হাসলাম। মধুর ভঙ্গির হাসি। ভদ্রলোকের ভুরু আরো কুঁচকে গেল।

বুঝলেন হিমু, যা করবেন স্ট্রেইট করবেন। বাঁকা পথে করবেন না। 'ছিরাতুল মুস্তাকিম'— সরল পথ। কোথায় আছে বলেন দেখি ?

সূরা ফাতেহা।

গুড। নিন টেলিফোন, যত ইচ্ছা বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করুন। আবার যখন দরকার হবে চলে আসবেন। স্লিপ ছিঁড়ে ফেলে দিন। আমার সামনেই ছিঁড়ুন।

আমি স্লিপ ছিঁড়লাম। ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, গুড। নিন, কথা বলুন। যা ইচ্ছা বলতে পারেন। আমি শুনব না। আমি একটু দূরে যাচ্ছি। ভদ্রলোক সরে গেলেন। রূপাকে দ্বিতীয়বার টেলিফোন করার কোনো অর্থ হয় না। আমার আর কোনো বান্ধবীও নেই। টেলিফোন করলাম বড়খালার বাসায়। খালু ধরলেন, মিহি গলায় বললেন, কে হিমু ?

খালু, আপনি অফিসে যান নি ?

আর অফিসে যাওয়া-যাওয়ি, যে যন্ত্রণা বাসায়!

কী হয়েছে ?

তোমার খালা যা শুরু করেছে এতে আমার পালিয়ে যাওয়া ছাড়া পথ নেই।

খালা এখন করছেন কী ?

জিনিসপত্র ভাঙছে। আর কী করবে! আমাকে যে সব কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিচ্ছে তা শুনলে বস্তির মেয়েরাও কানে হাত দিবে।

অবস্থা মনে হয় সিরিয়াস।

আর অবস্থা! তুমি টেলিফোন করেছ কেন ?

জরুরি একটা খবর দেবার জন্যে টেলিফোন করেছিলাম। এখন আপনার কথাবার্তা শুনে ভুলে গেছি।

বাসায় আসো না কেন ?

চলে আসব। এখন কয়েকদিন একটু ব্যস্ত। ব্যস্ততা কমলেই চলে আসব।

তোমার আবার কিসের ব্যস্ততা ?

নিষ্পাপ মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছি খালুজান।

কী খুঁজে বেড়াচ্ছ ?

নিষ্পাপ মানুষ।

টেলিফোনেই শুনলাম ঝনঝন শব্দে কী যেন ভাঙল। খালুজান খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। আমার মনে হয় পালিয়ে গেলেন।

দুপুরের খাবার খাচ্ছি ছাপড়া হোটেলে। রুটি ডাল গোশত। গরম গরম রুটি ভেজে দিচ্ছে। ডাল গোশত ভয়াবহ ধরনের ঝাল। জিহ্বা পুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু খেতে হয়েছে চমৎকার। আমাকে খাওয়াচ্ছে একলেমুর মিয়া। সে আজ বড়ই চুপচাপ। অন্য সময় নিচু গলায় সারাক্ষণ কথা বলত। উচ্চশ্রেণীর কথাবার্তা। আজ কিছুই বলছে না। কারণ তার মেয়েটাকে সে দুদিন ধরে খুঁজে পাচ্ছে না। এটা কোনো বড় ব্যাপার না। মেয়েটা পাগলা টাইপের। প্রায়ই উধাও হয়ে যায়। আবার ফিরে আসে।

একলেমুর মিয়া আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি করল না। খাওয়ার শেষে মিষ্টি পান এনে দিল, সিগ্রেট এনে নিজেই ধরিয়ে দিল।

একলেমুর মিয়া।

জি।

ভিক্ষা করতে কেমন লাগে বলো দেখি ?

ভালো লাগে। কত নতুন নতুন মাইনষের সাথে পরিচয় হয়। এক এক মানুষ এক এক কিসিমের। বড় ভালো লাগে।

একলেমুর মিয়া খিকখিক করে হাসছে। আমি বললাম, হাসছ কেন ?

একবার কী হইছে হুনেন ভাইসাব, গাড়ির মইধ্যে এক ভদ্রলোক বহা আছে। আমি হাতটা বাড়াইয়া বললাম, ভিক্ষা দেন আল্লাহর নামে। সাথে সাথে হেই লোক হাত বাড়াইয়া দিছে আমার গালে এক চড়।

কেন ?

এইটাই তো কথা। কী কইলাম আফনেরে— নানান কিসিমের মানুষ এই দুনিয়ায়। এরার সাথে পরিচয় হওয়া একটা ভাগ্যের কথা। ঠিক কইলাম না ?

ঠিক না বেঠিক বুঝতে পারছি না।

এই এক সারকথা বলছেন ভাইজান। ঠিক-বেঠিক বুঝা দায়। ক্ষণে মনে লয় এইটা ঠিক, ক্ষণে মনে লয় উঁহুঁ এইটা ঠিক না।

চড় দেয়ার পর ঐ লোক কী করল ? গাড়ি করে চলে গেল ?

সাথে সাথে যায় নাই। লাল বাত্তি জ্বলতেছিল। যাইব ক্যামনে ? সবুজ বাত্তির জন্যে অপেক্ষা করতেছিল।

তোমাকে কিছু বলে নি ?

জে না। অনেকক্ষণ তাকাইয়াছিল। কিছু বলে নাই।

তুমি কী করলে ?

আমি হাসছি।

সিগারেট শেষ টান দিতে দিতে আমি বললাম, ঐ লোকের সঙ্গে তোমার তো আবার দেখা হয়েছিল, তাই না ?

বুঝলেন ক্যামনে ?

আমার সে রকমই মনে হচ্ছে।

ধরছেন ঠিক। উনার সঙ্গে দেখা হইছে। ঠিক আগের জায়গাতেই দেখা হইছে। আমি বললাম, স্যার আমারে চিনছেন ? ঐ যে চড় মারছিলেন।

লোকটা কী বলল ?

কিছু বলে নাই, তাকাইয়াছিল। তবে আমার চিনতে পারছে। বড়ই মজার এই দুনিয়া ভাইসাব! লোকে দুনিয়ার মজাটা বুঝে না। মজা বুঝলে— দুঃখ কম পাইত।

উঠি একলেমুর মিয়া।

আমি উঠলাম। একলেমুর ফার্মগেটের ওভারব্রিজে গামছা বিছিয়ে বসে পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন একটা ময়লা এক টাকার নোট ছুড়ে ফেলল গামছায়।

একলেমুর নিচু গলায় বলল, অচল নোট। টেপ মারা, ছিঁড়া। কেউ নেয় না। ফকিররে দিয়া দেয়। এক কামে দুই কাম হয়— সোয়াব হয়, আবার অচল নোট বিদায় হয়। মানুষ খালি সোয়াব চায়, সোয়াব। অত সোয়াব দিয়া হইব কী ?

দুপুরে আমার ঘুমের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গা আছে— পার্ক। কখনো সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, কখনো চন্দ্রিমা উদ্যান, কখনো সন্তাদরের কোনো মিউনিসিপ্যালটি পার্ক। যখন যেটা হাতের কাছে পাই।

ফার্মগেট থেকে চন্দ্রিমা উদ্যান এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যান দুটাই সমান দূরত্বে। তবে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান আমার প্রিয়। সেখানকার বেঞ্চগুলো ঘুমানোর জন্যে ভালো। তাছাড়া সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ড্রামা অনেক বেশি। দুপুরে ঘুমিয়ে পড়ার আগে মজার মজার সব দৃশ্য দেখা যায়। ক'দিন ধরেই দেখছি স্কুলের ড্রেসপরা এক মেয়ে মাঝবয়সী এক লোকের সঙ্গে পার্কে ঘোরাঘুরি করছে। লোকটার হাবভাবেই বোঝা যায় মতলব ভালো না। সুযোগমতো লোকটাকে একটা শিক্ষা দিতে হবে।

আরাম করে শুয়ে আছি। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ফিল্টার হয়ে রোদ এসে গায়ে পড়েছে। আরাম লাগছে— স্কুলের ওই মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে। আচার খাচ্ছে। সঙ্গে মিচকা শয়তানটা আছে। মিচকা শয়তানটা বসার জায়গা পাচ্ছে না। ভালো ভালো সব জায়গা দখল হয়ে আছে। মিচকাটা হতাশ গলায় বলল, পলিন, কোথায় বসি বলো তো ?

পলিন মেয়েটা মুখভর্তি আচার নিয়ে বলল, বসব না। হাঁটব।

লোকটা মেয়েটার বগলের কাছে মুখ দিয়ে কী যেন বলল। পলিন মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, কেন শুধু অসভ্য কথা বলেন ?

লোকটা হে-হে করে হাসছে। লোকটার কথা শুধু যে অসভ্য তাই নয়— হাসিটাও অসভ্য। ঠাস করে এর গায়ে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে আবার নির্বিকার ভঙ্গিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে কেমন হয় ?

সভ্য সমাজে আজগুবি কিছু করা যায় না। আমি চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়লাম।



কাল সারারাত ঘুম হয় নি।

ঘুম না হবার কোনো কারণ ছিল না। কারণ ছাড়াই এই পৃথিবীতে অনেক কিছু ঘটে। দিনের আলো ফোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে ঘুমোতে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে চোখভর্তি ঘুম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। ঘুম ভাঙল স্বপ্ন দেখে। আমার বাবাকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমার গা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলছেন, এই হিমু, হিমু, ওঠ। তাড়াতাড়ি ওঠ। ভূমিকম্প হচ্ছে। ধরণী কাঁপছে।

আমি ঘুমের মধ্যেই বললাম, আহ, কেন বিরক্ত করছ?

বাবা ভরাট গলায় বললেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো মজার ব্যাপার আর হয় না। ভেরি ইন্টারেস্টিং। এই সময় চোখকান খোলা রাখতে হয়। তুই বেকুবের মতো শুয়ে আছিস।

ঘুমোতে দাও বাবা।

তোর ঘুমোলে চলবে না। মহাপুরুষদের সবকিছু জয় করতে হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘুম। ঘুম হচ্ছে দ্বিতীয় মৃত্যু। সাধারণ মানুষ ঘুমায়— অসাধারণরা জেগে থাকে।...

দয়া করে ঝাঁকুনি বন্ধ করো, প্লিজ।

আমার ঘুম ভাঙল। আমি বিছানায় উঠে বসলাম। চৌকি কাঁপছে। দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবিওয়ালা এক ক্যালেন্ডার। সেই রবীন্দ্রনাথও কাঁপছেন। আমি বুঝতে পারছি না এটাও স্বপ্নের কোনো অংশ কি না। মানুষের স্বপ্ন অসম্ভব জটিল হতে পারে।

না, এটা বোধহয় স্বপ্ন না। বোধহয় সত্যি। কটকট, কটকট শব্দ হচ্ছে। অনেকদিন পর ভূমিকম্প অনুভব করছি। আমি বালিশের নিচ থেকে সিগারেট বের করলাম।

স্বপ্ন সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্যে সিগারেট ধরানো। স্বপ্ন শুধু যে বর্ণহীন তাই না— গন্ধহীনও। সিগারেট ধরাবার পর তার উৎকট গন্ধ যদি নাকে

আসে তাহলে বুঝতে হবে এটা স্বপ্ন নয়— সত্য। কেউ একজন আযান দিচ্ছে। এই সময় আযানের অর্থ হলো— বিপদ। মহাবিপদ। হে আল্লাহ, রক্ষা করো। বিপদ থেকে বাঁচাও।

সিগারেট ধরাতে পরছি না। হাত কাঁপছে— শরীরের প্রতিটি জীবিত কোষের ডিএনএ অণু সুদূর অতীত থেকে ভয়ের স্মৃতি নিয়ে এসেছে। সে ভূমিকম্পের মতো অস্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের ভয় পাওয়াবেই। ভয় পাইতে না চাইলেও ভয় পাওয়াবে।

আগুন দেখলে আমরা তেমন ভয় পাই না। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সময় ছুটে পালিয়ে যাই না। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি কিন্তু ভূমিকম্পের সামান্য কম্পনেই তীব্র ইচ্ছা করে ছুটে কোথাও চলে যেতে।

না, ভয় পেলে চলবে না। মনকে শান্ত করতে হবে। স্থির করতে হবে। সিগারেট ধরালাম। তামাকের উৎকট গন্ধ।

এটা স্বপ্ন নয়। এটা সত্যি। ভূমিকম্প হচ্ছে। পরপর দুটা ঝাঁকুনি। ভয় কমছে। মন শান্ত হয়ে আসছে। চারপাশের পৃথিবীকে এখন আর অবাস্তব মনে হচ্ছে না।



ছোট্ট একটা ভূমিকম্প হয়েছে।

রিখটার স্কেলে এর মাপ দু-তিনের বেশি হবে না। পরপর দুবার সামান্য ঝাঁকুনি। এতেই হইচই, ছোটাছুটি। আমার পাশের ঘরে তাসখেলা হচ্ছিল। গতকাল রাত এগারটায় শুরু হয়েছিল, এখন সকাল আটটা। এখনো চলছে। ছুটির দিনে পয়সা দিয়ে খেলা হয়। ম্যারাথন চলে। তাসুড়েরা তাস ফেলে প্রথম হইচই করে বারান্দায় এলো, তারপর সবাই একসঙ্গে ছুটল সিঁড়ির দিকে। মনে হচ্ছে, এরা সিঁড়ি ভেঙে ফেলবে।

আমি সিগারেট টানছি। ছুটে নিচে যাবার তেমন কোনো পরিকল্পনা নেই। তবে অবহেলার ভঙ্গি করে বিছানায় শুয়ে থাকারও অর্থ হয় না। প্রকৃতি ভয় দেখাতে চাচ্ছে— আমার উচিত ভয় পাওয়া। বাঁচাও বাঁচাও বলে রাস্তায় ছুটে যাওয়া। ভয় পেয়ে দল বেঁধে ছোটাছুটিরও আনন্দ আছে। আমি দরজার বাইরে এসে দেখি, বারান্দায় দবির খাঁ বসে নামাযের ওযু করছেন। সকাল নটা কোনো নামাযের সময় না। দবির খাঁ প্রায় সারারাত জেগে থেকে শেষরাতে ঘুমিয়ে পড়েন বলে ফজরের নামায পড়তে বেলা হয়। দবির খাঁ আমার দিকে তাকিয়ে ভীত গলায় বললেন, হেমু, ভূমিকম্প।

আমার নাম হেমু নয়, হিমু। দবির খাঁ কখনো হিমু বলেন না। মনে হয় তিনি ই-কারান্ত শব্দ বলতে পারেন না।

হেমু সাহেব, ভূমিকম্প। নামেন নামেন, রাস্তায় যান।

আপনি বসে আছেন কেন ? আপনিও যান।

দবির খাঁ হতাশ চোখে তাকাল। তখন মনে পড়ল— এই লোকের পায়ে সমস্যা আছে। হাঁটতে পারে না। মাটিতে বসে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়। তাঁর পক্ষে দোতলা থেকে একতলায় একা নামা সম্ভব নয়।

নিচে নামতে চাইলে আমি ধরাধরি করে নামাতে পারি। নামবেন ? নাকি বসে বসে নামায পড়বেন ? আপনার ওযু কি শেষ হয়েছে ?

দবির খাঁ মনস্থির করতে পারছেন না। আমি বললাম, ধরুন শক্ত করে আমার হাত, নামিয়ে দিচ্ছি।

দবির খাঁ ক্ষীণ গলায় বললেন, যা হবার হয়ে গেছে। আর বোধহয় হবে না।

হবে। ভূমিকম্পের নিয়ম হলো— প্রথম একটা ছোট, ওয়ার্নিঙের মতো। সবাই যাতে সাবধান হয়ে যায়। তারপরেটা বড়। যাকে বলে হেভি ঝাঁকুনি।

বলেন কী ?

নামবেন নিচে ?

জি নামব, অবশ্যই নামব।

দবির খাঁ গন্ধমাদন পর্বতের কাছাকাছি। আমার পক্ষে একা তাঁকে নামানো প্রায় অসম্ভব কাজের একটি। ডুবন্ত মানুষ যেভাবে অন্যের গলা জড়িয়ে ধরে তিনিও সেভাবে দু'হাতে আমার গলা চেপে ধরেছেন। আমরা দুজন প্রায় ফুটবলের মতো গড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছি।

কলঘরে মেসের ঝি ময়নার মা বাসন ধুতে বসেছে। ভূমিকম্পের বিষয়ে সে নির্বিকার। একমনে বাসন ধুয়ে যাচ্ছে। আমাদের নামার দৃশ্যে সে খানিকটা আলোড়িত হলো। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছে। দবির খাঁ চাপা গলায় বললেন— মাগির কারবার দেখেন। দেখছেন কাপড়চোপড়ের অবস্থা ? এইরকম কাপড় পরার দরকার কী ? নেংটা থাকলেই হয়।

ময়নার মার স্বাস্থ্য ভালো, সে দেখতেও ভালো। মায়া-মায়া চোখমুখ। কাজকর্মেও অত্যন্ত ভালো। শুধু একটাই দোষ তার— কাপড়চোপড় ঠিক থাকে না, কিংবা সে নিজেই ঠিক রাখে না। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সে হাসছে। তার ব্লাউজের সব কটি বোতাম খোলা। এদিকে তার ভ্রূক্ষেপও নেই।

দবির খাঁ চাপা গলায় বললেন, হেমু সাহেব! দেখলেন মাগির অবস্থা! ইচ্ছা করে বোর্ডারদের বুক দেখিয়ে বেড়ায়। শেষ জামানা চলে এসেছে। একেবারে শেষ জামানা। লজ্জা-শরম সব উঠে গেছে। আইয়েমে জাহেলিয়াতের সময় যেমন ছিল— এখনো তেমন।

আমার রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভূমির দ্বিতীয় কম্পনের জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিছুই হলো না। দবির খাঁকে রাস্তার একপাশে বসিয়ে দিয়েছি। তিনি সিগারেট টানছেন। তাঁকে ঘিরে ছোটখাটো একটা জটলা। কেউ বোধহয় মজার কোনো গল্প করছে। আমি দূরে আছি বলে গল্পের কথক কে বুঝতে পারছি না। আমি ইচ্ছা করেই দবির খাঁর কাছ থেকে দূরে সরে আছি। এই পর্বতকে আবার দোতলায় টেনে তোলা আমার কর্ম নয়। এই পবিত্র দায়িত্ব অন্য কেউ পালন করুক।

হিমু না ? এদিকে শুনে যান তো ?

আমাদের মেসের মালিক বিরক্তমুখে আমাকে ডাকলেন। এই লোকটা আমাকে দেখলেই বিরক্ত হন। যদিও মেসের ভাড়া আমি খুব নিয়মিত দেই, এবং কখনো কোনোরকম ঝামেলা করি না। আমি হাসিমুখে ভদ্রলোকের কাছে গেলাম। আন্তরিক ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করতে করতে বললাম, কী ব্যাপার, সিরাজ ভাই ? আমার হাসিতে তিনি আরো রেগে গেলেন বলে মনে হয়। চোখমুখ কুঁচকে বললেন, আপনি কোথায় থাকেন কী করেন কে জানে— আমি কোনো সময় আপনাকে খুঁজে পাই না।

এই তো পেলেন।

এর আগে আমি চারবার আপনার খোঁজ করেছি। যতবার খোঁজ নেই শুনি ঘর তালাবদ্ধ। থাকেন কোথায় ?

রাস্তায় রাস্তায় থাকি।

রাস্তায় রাস্তায় থাকলে খামাখা মেসে ঘর ভাড়া করে আছেন কেন ? ঘর ছেড়ে দেবেন। সামনের মাসের এক তারিখে ছেড়ে দেবেন।

এটা বলার জন্যেই খোঁজ করছিলেন ?

হুঁ।

রাখতে চাচ্ছেন না কেন ? আমি কি কোনো অপরাধ-টপরাধ করেছি ?

সিরাজ মিয়া রাগী গলায় বললেন, কাকে মেসে রাখব, কাকে রাখব না— এটা আমার ব্যাপার। আপনাকে আমার পছন্দ না।

ও আচ্ছা।

মাসের এক তারিখ ঘর ছেড়ে দেবেন। মনে থাকবে ?

হুঁ।

কোনোরকম তেড়িবেড়ি করার চেষ্টা করবেন না। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল কী করে বাঁকা করতে হয় আমি জানি।

সিরাজ মিয়া তর্জনী বাঁকা করে আমাকে বাঁকা আঙুল দেখিয়ে দিলেন। আমি সহজ গলাতেই বললাম— এটাই আপনার কথা, না আরো কথা আছে ?

এইটাই কথা।

আমি বললাম, কঠিন কথাটা তো বলা হয়ে গেল। এখন সহজ হন। সহজ হয়ে একটু হাসুন দেখি।

সিরাজ মিয়া হাসলেন না। তবে দবির মিয়াকে ঘিরে যে দলটা জটলা পাকাচ্ছিল সে দলটার ভেতর থেকে হো-হো হাসির শব্দ উঠল।

হাসির অনেক ক্ষমতার ভেতর একটা ক্ষমতা হলো— হাসি ভয় কাটিয়ে দেয়। এদের ভয় কেটে গেছে। এরা কিছুক্ষণের মধ্যেই মেসবাড়িতে ফিরে যাবে। তাসখেলা আবার শুরু হবে। দবির খাঁ ওযু করে তার ফজরের কাজা নামায শেষ করবেন।

ছুটির দিনের ভোরবেলায় একটা ছোটখাটো ভূমিকম্প হওয়াটা মন্দ না। চারদিকে উৎসব উৎসব ভাব এসে গেছে। বড় একটা বিপদ হওয়ার কথা ছিল, হয় নি। সেই আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সহমর্মিতার আনন্দ। বড় ধরনের বিপদের সামনেই একজন মানুষ অন্য একজনের কাছে আশ্রয় খোঁজে। পৃথিবীতে ভয়াবহ ধরনের বিপদ-আপদেরও প্রয়োজন আছে।

মেসে আজ ইমপ্রুভড ডায়েটের ব্যবস্থা হচ্ছে। মাসের প্রথম সপ্তাহের বৃহস্পতিবার ইমপ্রুভড ডায়েট হয়। আজ তৃতীয় সপ্তাহ চলছে, ইমপ্রুভড ডায়েটের কথা না— ভূমিকম্পের কারণেই এই বিশেষ আয়োজন।

আমি ইমপ্রুভড ডায়েটের ঝামেলা এড়াবার জন্যে দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছি। হাতে দশটা টাকাও নেই। ইমপ্রুভড ডায়েটের ফেরে পড়লে কুড়ি-পঁচিশ টাকা চাঁদা দিতে হবে। কোত্থেকে দেব ?

এরচে' শুয়ে শুয়ে নিষ্পাপ মানুষের প্রাথমিক তালিকাটা করে ফেলা যাক। একলেমুর মিয়ার নাম লেখা যেতে পারে। ভিক্ষা করা ছাড়া আর কোনো পাপ তার আছে বলে মনে হয় না। ভিক্ষা নিশ্চয়ই পাপের পর্যায়ে পড়ে না। এই পৃথিবীর অনেক মহাপুরুষই ভিক্ষাবৃত্তি করতেন। তাছাড়া একলেমুর মিয়ার কিছু সুন্দর নিয়মকানুনও আছে। যেমন— সে ভিক্ষার টাকা জমা করে রাখে না। সন্ধ্যার পর যা পায় তার পুরোটাই খরচ করে ফেলে। অন্য ভিক্ষুকদের রাতের খাওয়া খাইয়ে দেয়।

খাতায় লিখলাম—

১। একলেমুর মিয়া, পেশায় ভিক্ষুক।
বয়স ৪৫ থেকে ৫৫
ঠিকানা : জোনাকী সিনেমাহলের গাড়ি বারান্দা।
শিক্ষা : ক্লাস থ্রি পর্যন্ত।

২। মনোয়ার উদ্দিন।

পেশায় ব্যাংকের জুনিয়র অফিসার।

শিক্ষা : বিএ অনার্স।

এই পর্যন্ত লিখেই থমকে যেতে হলো। মনোয়ার উদ্দিন আমার পাশের ঘরে থাকেন। তার সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানি না। শুধু মনে হয় লোকটা ভালো। তাঁকে একদিন দেখেছি আমার কলঘরে একটা ছ'সাত বছরের বাচ্চার মাথায় পানি ঢালছেন। জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে ? তিনি জানালেন, ছেলেটা নর্দমায় পড়ে গিয়ে কাঁদছিল। তিনি তুলে নিয়ে এসে গা ধোয়াচ্ছেন।

বুঝলেন হিমু সাহেব একটা আস্তা লাক্স সাবান হারামজাদার গায়ে ডলেছি তারপরেও গন্ধ যায় না।

মনোয়ার উদ্দিন সাহেবের নামটা লিস্টে রাখা যেতে পারে। ফাইন্যাল স্ক্রুটিনিতে বাদ দিলেই হবে।

আরো দুটো নাম ঝটপট লিখে ফেললাম। প্রসেস অব এলিমিনেশনের মাধ্যমে বাদ দেয়া হবে। এর মধ্যে আছে মোহাম্মদ রজব খোন্দকার, সেকেন্ড অফিসার, লালবাগ থানা। তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন— পুলিশ হয়ে জন্মেছি ঘুস খাব না তা তো হয় না। গোয়ালাকে যেমন দুধে পানি মেশাতেই হয় পুলিশকে তেমনি ঘুস খেতে হয়। আমিও খাব। শিগগির খাওয়া ধরব। তবে ঠিক করে রেখেছি প্রথম ঘুস খাবার আগে তরকারির চামচে এক চামচ মানুষের 'গু' খেয়ে নেব। তারপর শুরু করব জোরেশোরে। 'গু'টা খেতে পারছি না বলে ঘুস খাওয়া ধরতে পারছি না। তবে ঘুস তো খেতেই হবে। একদিন দেখবেন আঙুল দিয়ে নাক চেপে চোখ বন্ধ করে এক চামচ মানুষের গু খেয়ে ফেলব। জিনিসটা খেতে হয়তো বা খারাপ হবে না। কুকুরকে দেখেন না— কত আগ্রহ করে খায়। কুকুরের সঙ্গে মানুষের অনেক মিল আছে।

এখন নাম হলো চারটা—

(১) একলেমুর মিয়া

(২) মনোয়ার উদ্দিন

(৩) মোহাম্মদ রজব খোন্দকার

(৪) রূপা

মনোয়ার উদ্দিনের নাম রাখাটা বোধহয় ঠিক হবে না। বড়ই তরল স্বভাবের মানুষ। তরল স্বভাবের মানুষের পক্ষে পবিত্র থাকাটা কঠিন কাজ। তাঁকে প্রায়ই দেখা যায় ময়নার মার সামনে উবু হয়ে বসে গল্প করছেন। ময়নার মা মুখ

ঝামটা দিয়ে বলছে— একটু সইরা বসেন না— এক্কেবারে শইল্যের উপরে উইঠ্যা বসছেন। হি-হি-হি।

সেই হাসি প্রশ্রয়ের হাসি। আহ্বানের হাসি। তরল স্বভাবের মানুষ যত পবিত্রই হোক এই হাসির আহ্বান অগ্রাহ্য করতে পারবে না।

আমি লাল কালি দিয়ে মনোয়ার উদ্দিনের নাম কেটে দিলাম।

দরজায় টোকা পড়ছে। আমি খাতা বন্ধ করে দরজা খুলে দিলাম।

মনোয়ার সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি অত্যন্ত ব্যস্তভঙ্গিতে বললেন, কুড়িটা টাকা ছাড়ুন তো হিমু সাহেব। স্পেশাল খানা হবে— রহমত বাবুর্চিকে নিয়ে এসে খাসির রেজালা আর পোলাও।

আমি শুকনো মুখে বললাম, আমার কাছে একটা পয়সা নেই।

সামান্য কুড়ি টাকাও নেই ? কী বলছেন আপনি! দেখি আপনার মানিব্যাগ ?

মনোয়ার সাহেব নাছোড় প্রকৃতির মানুষ। মানিব্যাগ দিয়ে দিলাম। শূন্য মানিব্যাগ তিনি খুবই বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন।

এত সুন্দর একটা মানিব্যাগ খালি করে ঘুরে বেড়ান কী করে ?

ঘুরে বেড়াই আর কোথায়, সারাদিনই তো বিছানায় শোয়া।

আচ্ছা থাক, টাকা দিতে হবে না। আপনি আমার গেস্ট। আপনার খরচ আমি দেব। নো বিগ ডিল। তবে আপনাকে কাজ করতে হবে। বসিয়ে রেখে খাওয়াব না।

কী কাজ ?

আমার সঙ্গে বাজার-সদাই করবেন। খাসির গোশত দেখেশুনে কিনতে হবে। চট করে প্যান্ট পরে নিন।

আমি প্যান্ট পরলাম। মনোয়ার সাহেব এলেন পিছু পিছু।

খাসির গোশত কেনা কোনো ইজি ব্যাপার না, বুঝলেন ভাই। ইট ইজ এ ডিফিকাল্ট জব। খাসির ওজন হতে হয় সাত সের। এরচে' কম ওজনের হলে মাংস গলে যায়। বেশি হলে চর্বি হয়ে যায়। বুঝলেন ?

জি বুঝলাম।

খাসির গোশত রান্না করাও খুব ডিফিকাল্ট। একটু এদিক-ওদিক হলে all gone. গোশত নষ্ট হয় কিসে বলুন তো ?

বলতে পারছি না।

আলু। আলু দিয়েছেন কি কর্ম কাবার। আলু গলে যায়, সরুয়া থিক হয়ে যায়...

ভদ্রলোকের হাত থেকে যে করেই হোক উদ্ধার পেতে হবে। কোনো বুদ্ধি মাথায় আসছে না।

মনোয়ার ভাই।

বলুন।

একটু বসুন তো আমার ঘরে। এক দৌড় দিয়ে নিচ থেকে আসছি— একটা পান খেয়ে আসি। বমি-বমি লাগছে।

যাওয়ার পথে পান কিনে নিলেই হবে।

না না— এক্ষুণি পান লাগবে।

আমি ছুটে বের হয়ে এলাম। আর ফিরে না গেলেই হবে। মনোয়ার সাহেব অনেকক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। নিজের ঘর থেকে তালা এনে আমার ঘর বন্ধ করবেন। নিচে খানিকটা খোঁজখবরও করবেন— তারপর সব পরিষ্কার হবে। তিনি সাত সের ওজনের খাসি কিনতে বের হবেন।

মোড়ের পানের দোকান থেকে একটা পান কিনলাম। পান খাওয়ার কথা বলে বের হয়েছি, না খাওয়াটা ঠিক হবে না। মিথ্যার সঙ্গে খানিকটা সত্য মিশে থাকুক। যদিও ভোরবেলা আমি কখনো পান খেতে পারি না। ঘাস খেয়ে একটা দিন শুরু করার মানে হয় না। ঘাস যদি খেতেই হয় দিনের শেষভাগে খাওয়া ভালো।

কোথায় যাব ঠিক করতে পারছি না। ইয়াকুব সাহেবকে কি বলে আসব— চিন্তা করবেন না— কাজ এগোচ্ছে। নাম লিস্ট করা শুরু হয়েছে। গোটা বিশেক নাম পাওয়া গেছে। সেখান থেকে নাম কাটতে কাটতে একটা নামে আসব। সময় লাগবে। ধৈর্য ধরতে হবে। মানুষের ধৈর্য নেই। মানুষের বড়ই তাড়াহুড়া। পবিত্র গ্রন্থ কোরান শরিফেও বলা হয়েছে— 'হে মানব সন্তান, তোমাদের বড়ই তাড়াহুড়া।'

বেশ কয়েকটা খালি রিকশা আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছে। রিকশাওয়ালারা আশা-আশা চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। খালি রিকশা দেখলেই চড়তে ইচ্ছা করে। ভুল বললাম, খালি রিকশা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে চড়তে ইচ্ছা করে না। চলন্ত খালি রিকশা দেখলে চড়তে ইচ্ছা করে। আমি এ রকম চলন্ত একটা রিকশায় প্রায় লাফিয়ে উঠে পড়লাম। রিকশাওয়ালা হাসিমুখে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখল। কোথায় যেতে চাই কিছু জানতে চাইল না। মনে হচ্ছে এ বিপজ্জনক ধরনের রিকশাওয়ালা— যেখানে সে রওনা হয়েছে সেখানেই যাবে। মাঝপথে লাফ দিয়ে রিকশা থেকে নেমে পড়লেও কিছু বলবে না, ভাড়া দেন,

ভাড়া দেন, বলে চেঁচাবে না। ঢাকা শহরে রিকশাওয়ালাদের সাইকোলজি নিয়ে কেউ এখনো গবেষণা করেন নি। গবেষণা করলে মজার মজার জিনিস বের হয়ে আসত।

মতিঝিলের কাছে আমি লাফ দিয়ে রিকশা থেকে নামলাম। রিকশাওয়ালা আবার হাসিমুখে তাকাল। সে রিকশার গতি কমাল না। যে গতিতে চালাচ্ছিল সেই গতিতেই চালাতে লাগল। আর তখনি বুঝতে পারলাম, এই রিকশাওয়ালা আমার পূর্বপরিচিত। এর নাম হাসান। হাসানের কী যেন একটা ইন্টারেস্টিং গল্প আছে। গল্পটা মনে পড়ছে না। আচ্ছা, হাসানের নামটা কি লিস্টিতে তুলব ? আপাতত থাক, পরে কেটে দিলেই হবে। প্রসেস অব এলিমিনেশন। হারাধনের দশটি ছেলে দিয়ে শুরু হবে— শেষ হবে এক ছেলেতে।

বড় খালুর অফিস মতিঝিলে।

অনেকদিন পর তাঁর অফিস ঘরে উঁকি দিলাম। ভুরভুর করে এলকোহলের গন্ধ আসছে। খালু সাহেব মনে হয় এলকোহলের মাত্রা বাড়িয়েই দিচ্ছেন। আগে অফিসে এলে এই গন্ধ পাওয়া যেত না। এখন যায়।

আসব খালু সাহেব ?

আয়।

বোঝাই যাচ্ছে তিনি প্রচুর পান করেছেন। এমনিতে তিনি আমাকে তুমি করে বলেন। মাতাল হলেই— তুই। মাতালরা অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে কথা বলতে ভালোবাসে।

আমি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, গরমের মধ্যে স্যুট পরে আছেন কেন ?

খালু সাহেব ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। মনে হচ্ছে আমাকে চিনতে পারছেন না।

বসতে পারি খালু সাহেব ? নাকি জরুরি কিছু করছেন ?

বোস।

আমি বসলাম। খালু সাহেবকে বুড়োটে দেখাচ্ছে। চকচকে টাইও তাঁর বুড়োটে ভাব ঢাকতে পারছে না। আমি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্যে বললাম, ভূমিকম্প টের পেয়েছিলেন ? বড় খালু ভূমিকম্পের ধার দিয়ে গেলেন না। নিচু গলায় বললেন, চা খাবি ?

হুঁ।

তিনি যন্ত্রের মতো বেল টিপে চায়ের কথা বললেন। আমি হাসিমুখে বললাম, এলকোহলের গন্ধ পাচ্ছি।

বড়খালু রোবটের মতো গলায় বললেন, টেবিলে বার্নিশ লাগানো হয়েছে। বার্নিশের গন্ধ পাচ্ছিস।

ও আচ্ছা। আমি ভেবেছিলাম আপনি বোধহয় আজকাল অফিসেও চালাচ্ছেন।

ঠিকই ভেবেছিস। ভালোমতোই চালাচ্ছি। কেউ এলে বলি— টেবিলে বার্নিশ দিয়েছি। সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত লোকজন লজ্জা পেয়ে যায়। তুই যেমন পেয়েছিস।

কিন্তু আপনার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলার পরই তো সবাই বুঝে যায় যে বার্নিশ টেবিলে না, আপনি বার্নিশ লাগিয়েছেন আপনার স্টমাকে।

কেউ কিচ্ছু বোঝে না। মানুষের ইন্টেলিজেন্সকে ইনফ্লুয়েন্স করা যায়। হিউম্যান ইন্টেলিজেন্সের এইটাই হলো বড় ত্রুটি। বুঝতে পারছিস ?

হুঁ।

নে চা খা। চা খেয়ে বিদেয় হয়ে যা। টাকা-পয়সা লাগবে ?

না।

নিষ্পাপ মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছিস ?

হুঁ।

পাওয়া গেছে ?

গোটা বিশেক নাম পাওয়া গেছে। এদের মাঝখান থেকে বের করতে হবে।

গোটা বিশেক নাম পেয়েছিস ? বলিস কী ! সারা পৃথিবীতে তো ২০টা নিষ্পাপ লোক নেই। স্ট্রেঞ্জ! নামগুলো পড় তো শুনি।

পড়া যাবে না। গোপন।

এই কুড়িটা নাম পেলি কোথায় ?

পরিচিতদের মাঝখান থেকে যোগাড় করেছি।

ছেলে কটা, মেয়ে কটা ?

ফিফটি ফিফটি। দশটা ছেলে, দশটা মেয়ে।

বড় খালুকে উত্তেজিত মনে হচ্ছে। চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছেন। মাতাল মানুষ সহজেই উত্তেজিত হয়।

বাই এনি চান্স— তোর খালার নাম নেই তো ?

আমি হাসলাম। সেই হাসার যে-কোনো অর্থ হতে পারে। বড় খালু সেই হাসি না-সূচক ধরে নিলেন।

গুড। অতি পাপিষ্ঠা মহিলা। সাতটা দোজখের মধ্যে সবচে' খারাপটায় তার স্থান হবে বলে আমার বিশ্বাস।

তাই নাকি ?

অবশ্যই তাই। সাতটা দোজখের নাম জানিস ?

না।

সাতটা দোজখ হলো—

(১) জাহান্নাম

(২) হাবিয়া

(৩) সাকার

(৪) হুতামাহ

(৫) সায়ির

(৬) জাহিম

(৭) লাজা।

দোজখের নাম মুখস্থ করে রেখেছেন, ব্যাপার কী ?

যেতে হবে তো ওইখানেই। কাজেই মুখস্থ করেছি।

আপনি নিশ্চিত যে দোজখে যাবেন ?

অবশ্যই নিশ্চিত। তবে আমার স্থান সম্ভবত সাত নম্বর দোজখে হবে। সাত নম্বর দোজখ হলো 'লাজা'। এখানে শাস্তি কম। আমার শাস্তি কমই হবে। বড় ধরনের পাপ বলতে গেলে কিছুই করি নি। যেমন ধর, মানুষ খুন করি নি।

মানুষ খুন করেন নি ?

না।

মানুষ খুন করার ইচ্ছা হয়েছে কি না বলুন।

তা হয়েছে। অনেকবারই ইচ্ছা হয়েছে।

খুন করা এবং খুন করার ইচ্ছা প্রকাশ করা তো প্রায় কাছাকাছি।

তা ঠিক। এই জন্যেই তো আমার স্থান হবে লাজায় কিংবা জাহিমে।

আমি পকেট থেকে খাতাটা বের করতে করতে বললাম, মজার ব্যাপার কী জানেন বড় খালু— আপনার নাম কিন্তু নিষ্পাপ মানুষদের তালিকায় আছে।

বলিস কী ?

বড়খালু হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন। মনে হচ্ছে তার মদের নেশা কেটে যাচ্ছে।

দেখতে চান ?

তুই ঠাট্টা করছিস নাকি ?

না, ঠাট্টা করব কেন ?

আমি খাতা খুলে বড় খালুর নাম দেখিয়ে দিলাম। তিনি থ হয়ে বসে আছেন। টেবিলের উপর রাখা পানির গ্লাসের পানি এক চুমুকে শেষ করে দিলেন।

বড় খালু যাই ?

তিনি হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। খকখক করে কাশতে লাগলেন। ভয়াবহ কাশি। মনে হচ্ছে কাশির সঙ্গে ফুসফুসের অংশবিশেষ উঠে আসবে। আমি তাঁর কাশি থামার জন্যে অপেক্ষা করছি। একটা লোক প্রাণপণে কাশছে, এই অবস্থায় তাঁকে ফেলে চলে যাওয়া যায় না।

হিমু!

জি।

তুই সত্যি তাহলে আমার নাম তোর লিস্টে তুলেছিস ?

হুঁ।

নামটা খচ করে কেটে ফেল। তুই একটা কাজ কর। পাপীদের একটা লিস্ট কর। সেই লিস্টের প্রথম দিকে আমার নাম লিখে রাখ— In block letters.

আপনি চাইলে করব।

করব না— Do it. এক্ষুণি কর, এই নে কাগজ।

পরে এক সময় লিখে নেব।

নো, এক্ষুণি করতে হবে। রাইট নাউ।

বড় খালু হুঙ্কার দিলেন, হুঙ্কারের শব্দে সচকিত হয়ে তাঁর খাস বেয়ারা পর্দার আড়াল থেকে মাথা বের করল। বড় খালু বললেন— ভাগো। মারেগা থাপ্পড়...।

বাঙালি মাতাল যখন হিন্দি বলতে থাকে তখন বুঝতে হবে অবস্থা শোচনীয়। এদের ঘাঁটাতে নেই। আমি দ্রুত পাপীদের একটা তালিকা তৈরি করলাম। এক দুই তিন করে দশটা নম্বর বসিয়ে চার নম্বরে বড় খালুর নাম লিখে কাগজটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধরলাম।

চার নম্বরে কী মনে করে লিখলি ? কেটে এক নম্বরে দে। আমার কথা তুই কি আমার চেয়ে বেশি জানিস... গাধা কোথাকার! গিদ্ধর কি বাচ্চা, son of গিদ্ধর।

আমি দেরি করলাম না— তৎক্ষণাৎ তাঁর নাম কেটে এক নম্বরে নিয়ে গেলাম।

এখন আরেকটা নাম লেখ— মুনশি বদরুদ্দিন।

ক নম্বরে লিখব ?

এই লিস্টে না— পুণ্যবানদের লিস্টে।

মুনশি বদরুদ্দিন একজন পুণ্যবান ব্যক্তি ?

হ্যাঁ, এই লোক হলো পূর্ত মন্ত্রণালয়ের একজন ক্লার্ক। এক পয়সা ঘুস খায় না। পূর্ত মন্ত্রণালয়ের ক্লার্ক কিন্তু ঘুস খায় না— চিন্তা করেছিস কত বড় ব্যাপার ?

পূর্ত মন্ত্রণালয়ের ক্লার্কদের কি ঘুস খেতেই হয় ?

অবশ্যই খেতে হয়। দৈনিক খাদ্য গ্রহণের মতো খেতে হয়। তুই ওই লোকের কাছে যাবি। তার পা ছুঁয়ে সালাম করবি। পুণ্যবানদের স্পর্শ করলে মন পবিত্র হয়।

মুনশি বদরুদ্দিন ?

মুনশি বদরুদ্দিন তালুকদার। সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট। বেঁটেখাটো লোক। খুব পান খায়।

আমি তাহলে উঠি বড় খালু ?

আরেকটু বোস। তোর সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে।

মুনশি বদরুদ্দিন সাহেবের কাছে একটু যাব বলে ভেবেছি...।

যাব বললেই তো যেতে পারবি না। সেক্রেটারিয়েটে ঢুকবি কী করে ? পাসের ব্যবস্থা করতে হবে। টেলিফোনে তোর পাসের ব্যবস্থা করে দি— চা খাবি আরেক কাপ ?

না।

মাতালরা অন্যে কী বলছে তা শোনে না। তার কাছে শুধু নিজের কথাই সত্য। বড় খালু হুঙ্কার দিয়ে বললেন, ঐ, চা দিতে বললাম না। তিনি টেবিলের কাবার্ড খুলে— সাদা রঙের চ্যাপ্টা বোতল খুলে এক ঢোক তরল পদার্থ মুখে ঢেলে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গিলে ফেললেন না। কুলকোচার মতো শব্দ করতে লাগলেন। ভালো জিনিস চট করে গিলে ফেলতে তাঁর মনে হয় মায়া লাগছে। মুখে যতক্ষণ রাখা যায় ততক্ষণই আরাম।

হিমু!

জি বড় খালু।

তুই কেমন আছিস ?

খুব ভালো আছি। আপনার অবস্থা তো মনে হয় কাহিল।

আমিও ভালো আছি। সুখে আছি, আনন্দে আছি। তবে চারপাশের এখন যে অবস্থা, এই অবস্থায় আপনাআপনি আনন্দে থাকা যায় না। তরল পদার্থের কিছু সাহায্য লাগে। বুঝতে পারছিস রে গাধা ? গিদ্ধর কি ছানা, বুঝলি কিছু ?

বোঝার চেষ্টা করছি।

পারবি। তুই বুঝতে পারবি। তোর বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। তুই যে পুণ্যবান আর পাপীদের লিস্ট করছিস— খুব ভালো করছিস। পত্রিকায় এই লিস্ট ছাপিয়ে দিতে হবে। একদিন ছাপা হবে পুণ্যবানদের তালিকা, আরেকদিন ছাপা হবে পাপীদের তালিকা।

উঠি বড় খালু ?

এসেই উঠি উঠি করছিস কেন ? সেক্রেটারিয়েটে ঢোকার পাসের ব্যবস্থা করে দি।

বড় খালু টেলিফোন টেনে নিলেন... তাঁর কপাল খুব ঘামছে। মুখ হাঁ হয়ে আছে। টেলিফোনের ডায়ালও ঠিকমতো ঘোরাতে পারছেন না। তিনি ডায়াল ঘোরাচ্ছেন আর মুখে বলছেন— হ্যালো। হ্যালো।

মুনশি বদরুদ্দিন তালুকদারকে পাওয়া গেল না। তিনি দুদিন ধরে আসছেন না। আমি তাঁর বাসার ঠিকানা চাইলাম। অফিসের একজন মধুর গলায় বললেন, ঠিকানা দিয়ে কী করবেন ?

একটু কাজ ছিল।

কী কাজ বলুন। দেখি আমরা করতে পারি কি না।

উনার সঙ্গেই আমার কাজ ছিল।

উনার সঙ্গে কাজ থাকলে তো উনার কাছে যাবেন। বসুন না, দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?

আমি বসলাম। ভদ্রলোক নিচু গলায় বললেন, সিগারেটের বদঅভ্যাস আছে ?

খাই মাঝেমধ্যে।

মাঝেমধ্যে খাওয়াই ভালো। বিরাট খরচের ব্যাপার। স্বাস্থ্য নষ্ট। পরিবেশ নষ্ট। নেন সিগ্রেট নেন।

তিনি শার্টের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। বেনসন এন্ড হেজেস। সত্তর টাকা করে প্যাকেট। এই কেরানি ভদ্রলোক বেতন কত পান? হাজার তিনেক? তিনি খান বেনসন। ভদ্রলোজ নিজেই লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিলেন। সেই লাইটারও কায়দার লাইটার। যতক্ষণ জ্বলে ততক্ষণ বাজনা বাজে। ভদ্রলোক বললেন, কাজটা কি মিউটেশন? বড়ই জটিল কাজ। এই দপ্তরের সব কাজই জটিল। জমিজমা বিষয়-সম্পত্তির কাজ। মানুষের কোনো মূল্য নাই— জমির মূল্য আছে— বুঝলেন কিছু?

আমি বুঝদারের মতো মাথা নাড়লাম।

এক একটা নামজারির কাজ দেড় বছর-দুবছর ঝুলে থাকে।

নামজারি ব্যাপারটা কী?

নামজারি বুঝলেন না? মনে করুন, আপনি কিছু জমি কিনলেন। যার কাছ থেকে কিনলেন সরকারি রেকর্ডে আছে তার নাম। এখন তার নাম খারিজ করে আপনার নাম লিখতে হবে। এটাই নামজারি।

একজনের নাম কেটে আরেকজনের নাম লিখতে দেড় বছর লাগে?

দেড় বছর তো কম বললাম। মাঝে মাঝে দুই-তিন বছরও লাগে। নাম খারিজ করা তো সহজ ব্যাপার না।

এটাকে সহজ করা যায় না?

কীভাবে সহজ করবেন?

সবার নাম খারিজ করে দিন। এক্কেবারে লাল কালি দিয়ে খারিজ করে জমির মূল মালিকের নাম লিখে দিন।

ভদ্রলোক হতভম্ব গলায় বললেন, জমির মূল মালিক কে?

যিনি জমি সৃষ্টি করেছেন তিনিই মূল মালিক।

সবার নাম কেটে আল্লাহর নাম লিখতে বলছেন?

জি।

আপনার কি ব্রেইন ডিফেক্ট?

কিছুটা ডিফেক্ট। দেখুন ভাই সাহেব, পৃথিবীর জমি আমরা ভাগাভাগি করে নিয়ে নিয়েছি, নামজারি করছি। জোছনা কিন্তু ভাগাভাগি করে নেই নি। এমন কোনো সরকারি অফিস নেই যেখানে জোছনার নামজারি করা হয়, একজনের জোছনা আরেকজন কিনে নেয়।

ভদ্রলোক আমার কথায় তেমন অভিভূত হলেন না। পাগলদের মজার মজার কথায় কেউ অভিভূত হয় না, বিরক্ত হয়। তিনি একটা ফাইল খুলতে খুলতে

বললেন, আপনি এখন যান। কাজ করতে দিন। অফিস কাজের জায়গা। আড্ডা দেয়ার জায়গা না।

একটা সিগারেট দিন। সিগারেট খেয়ে তারপর যাই।

তিনি এমনভাবে তাকালেন যেন এমন অদ্ভুত কথা তিনি এই জীবনে শোনেন নি। আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, সিগারেট না খেয়ে আমি উঠব না। সিগারেট খাব। চা খাব। আর ভাই শুনুন, আমার হাতে কোনো পয়সাকড়ি নেই, আমি যে মুনশি বদরুদ্দিন তালুকদারের বাসায় যাব তার জন্যে আপ এন্ড ডাউন রিকশা ভাড়াও দেবেন।

ভদ্রলোক চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন। আমি গুনগুন করছি— বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিল তবে আমার পানে কেন পড়িল না...

কই ভাই, দিন। সিগারেট দিন।

ভদ্রলোক সিগারেট প্যাকেট বের করলেন।

মুনশি সাহেবের বাসায় ঠিকানা সুন্দর করে একটা কাগজে লিখে দিন।

উনার ঠিকানা জানি না।

না জানলে যোগাড় করুন। আপনি না জানলেও কেউ না কেউ নিশ্চয়ই জানে। সেই সঙ্গে আপনার নিজের ঠিকানাটাও এক সাইডে লিখে দেবেন। সময় পেলে এক ফাঁকে চলে যাব। ভাই, আপনার নাম তো এখনো জানলাম না।

চুপ থাকেন।

ধমক দেবেন না ভাই। পাগল মানুষ। ধমক দিলে মাথা আউলা হয়ে যায়। কয়েকটা শিঙ্গাড়া আনতে বলুন তো। খিদে লেগেছে—।

কেউ কিছু বলছে না। আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি আনন্দিত গলায় বললাম, ভূমিকম্পের সময় আপনারা কে কোথায় ছিলেন?

কথা বলবেন না চা খান।

শিঙ্গাড়া আনতে বলুন। ঘুসের পয়সার শিঙ্গাড়া খেয়ে দেখি কেমন লাগে?

আমি চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছি। অফিসের সবাই মোটামুটি হতভম্ব দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে।

মুনশি বদরুদ্দিনের যে ঠিকানা তারা লিখে দিল সেই ঠিকানায় এই নামে কেউ থাকে না। কোনোদিন ছিলও না। ওরা ইচ্ছা করে একটা বদমায়েশি করেছে। তবে ওরা এখনো বোঝে নি— আমিও কচ্ছপ প্রকৃতির। কচ্ছপের মতো যা একবার কামড়ে ধরি তা আর ছাড়ি না। পূর্ত মন্ত্রণালয়ে আমি একবার না,

প্রয়োজনে লক্ষবার যাব। দরকার হলে পূর্ত মন্ত্রণালয়ের বারান্দায় মশারি খাটিয়ে রাতে ঘুমোব।

সারাদুপুর রোদে রোদে ঘুরলাম। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমোতে গেলাম সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। ভরদুপুরে ঘুমানোর জন্যে বাংলাদেশ সরকার ভালো ব্যবস্থা করেছেন। ধন্যবাদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। পার্কগুলো কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে জানা নেই। জানা থাকলে ওদের একটা থ্যাংকস দেয়া যেত। গাছের নিচে বেঞ্চ পাতা। পাখি ডাকছে। এখানে-ওখানে প্রেমিক-প্রেমিকারা গল্প করছে। এরা এখন কিছুটা বেপরোয়া। ভরদুপুর হলো বেপরোয়া সময়। কেউ তাদের দেখছে কি দেখছে না তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। স্কুল ড্রেসপরা বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদেরও দেখা যায়। এরা স্কুল ফাঁকি দিয়ে আসে। একটা আইন কি থাকা উচিত না— আঠার বছর বয়স না হলে ছেলেবন্ধুর সঙ্গে পার্কে আসতে পারবে না। আইন যাঁরা করেন তাঁদের ডেকে এনে এক দুপুরে পার্কটা দেখাতে পারলে হতো।

সেই লোক মেয়েটির গায়ের নানান জায়গায় হাত দিচ্ছে। মেয়েটি খিলখিল করে হাসছে। চাপা গলায় বলছে,— এ রকম করেন কেন ? সুড়সুড়ি লাগে তো।

লোকটা ঠোঁট সরু করে বলল, আদর করি। আদর করি।

বলতে বলতে মেয়েটাকে সে টেনে কোলে বসিয়ে ফেলল। আমি কঠিন গলায় লোকটাকে বললাম, তুই কে রে ?

কোনো ভদ্রলোককে তুই বললে তার আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়। কী বলবে ভাবতে ভাবতে মিনিটখানেক লেগে যায়। আমি তাকে কিছু ভাবার সুযোগ দিলাম না। হুঙ্কার দিয়ে বললাম, এই মেয়ে কে ? তুই একে চটকাচ্ছিস ক্যান রে শুয়োরের বাচ্চা ? তুই চল আমার সঙ্গে থানায়। আমি ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোক। তোদের মতো বদমায়েশ ধরার জন্যে ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকি। মেয়েটাকে কোল থেকে নামা। নামিয়ে উঠে দাঁড়া। কানে ধর উঠ-বোস কর।

মেয়েটাকে কোল থেকে নামাতে হলো না। সে নিজেই নেমে পড়ল এবং কাঁদার উপক্রম করল। লোকটি কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। তারপর আমার কিছু বুঝবার আগেই ছুটে পালিয়ে গেল।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, এই লোক কে খুকি ?

আমার মামা।

আপন মামা ?

উঁহুঁ।

দূরের মামা ?

হুঁ।

পলিন, ঐ লোকটার নাম কী ?

পলিন ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে বলল, আপনি আমার নাম জানেন ?

আমি তোমার নাড়ি-নক্ষত্র জানি। ওই লোকটা যে বদ তা কি বুঝতে পারছ ?

পলিন ঘাড় বাঁকিয়ে রাখল। সে লোকটাকে বদ বলতে রাজি নয়।

বুঝলে পলিন, লোকটা মহা বদ। বদ না হলে তোমাকে ফেলে পালিয়ে যেত না। বদরাই বিপদের সময় বন্ধুকে ফেলে পালিয়ে যায়।

উনি বদ না।

কোন ক্লাসে পড় ?

ক্লাস এইট।

এরকম কারোর সঙ্গে যদি আর কোনোদিন দেখি তাহলে কী করব জান ?

না।

না জানাই ভালো। যাও, এখন স্কুলে যাও— এখন থেকে তোমার উপর আমি লক্ষ রাখব। একদিন তোমাদের বাসায় চা খেতে যাব।

আপনি কি চেনেন আমার বাসা ?

চিনি না কিন্তু তারপরেও যাব।

আপনি কি আমার মাকে সব বলে দেবেন ?

তুমি নিষেধ করলে বলব না।

আপনি কি আমার মাকে চেনেন ?

না।

পলিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তার মুখ থেকে কালো ছায়া সরে যাচ্ছে। সে খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, আমার মামাকে আপনি খারাপ ভাবছেন। উনি কিন্তু খারাপ না।

তাই নাকি ?

উনি খুব অসাধারণ।

বলো কী ? আমার তো অসাধারণ মানুষই দরকার। ঠিক অসাধারণ নয়— পবিত্র মানুষ। আমি পবিত্র মানুষদের একটা লিস্ট করছি। তুমি কি মনে করো ঐ লিস্টে তাঁর নাম রাখা যায় ?

অবশ্যই যায়।

তাঁর কী নাম ?

রেজা মামা। রেজাউল করিম।

আমি পকেট থেকে লিস্ট বের করে লিখলাম— রেজাউল করিম। এখন এই পলিন মেয়েটাকে চেনা চেনা লাগছে। কোথায় যেন তাকে দেখেছি। তার ভুরু কুঁচকানোর ভঙ্গি খুব পরিচিত। পলিন চলে যাবার পর বুঝলাম, এই মেয়ে আলেয়া খালার নাতনি। মেয়েটার মার নাম খুকি।

পলিন যেখানে বসেছিল সেখানে সে তার পেন্সিল বক্স ফেলে গেছে। বক্সটা ফিরিয়ে দিয়ে আসতে একদিন যেতে হবে ওদের বাসায়। পবিত্র মানুষ জনাব রেজাউল করিম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।



ইয়াকুব আলি সাহেবের ম্যানেজার মইন খান আজ স্যুট পরেছেন। আজ তাঁকে আরো সুন্দর লাগছে। বয়স কম লাগছে। গলায় লাল রঙের টাই। লাল টাইয়ে ভদ্রলোককে খুব মানিয়েছে। যারা কোনোদিন টাই পরে না তারাও এই ভদ্রলোককে দেখলে টাইয়ের দরদাম করবে।

স্লামালিকুম মইন সাহেব।

ওয়ালাইকুম সালাম।

আপনি কোত্থেকে ? সেই যে গেলেন আর কোনো খোঁজখবর নেই— স্যার খোঁজ করেন, আমি কিছু বলতে পারি না। আপনার মেসের ঠিকানায় দুদিন লোক পাঠিয়েছি— আপনি তো ভাই মেসে থাকেন না। কোথায় থাকেন ?

ইয়াকুব সাহেবের শরীর কেমন ?

ব্লাড ক্যানসারের রোগী— তার আবার শরীর কেমন থাকবে ? যতই দিন যাচ্ছে ততই খারাপ হচ্ছে। বাইরে থেকে রক্ত দেয়া হয় শরীরে। আয়রনের পরিমাণ বেড়ে যায়।

চলুন দেখা করা যাক।

এখন দেখা করতে পারবেন না। স্যার এখন ঘুমোচ্ছেন। আমার ঘরে এসে বসুন, গল্প-গুজব করুন। ঘুম ভাঙলে স্যারের কাছে নিয়ে যাব।

আমি ম্যানেজার সাহেবের ঘরে ঢুকলাম। তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন, গোপন কথা কিছু বলবেন কি না কে জানে!

হিমু সাহেব।

জি।

দুপুরে খেয়েছেন ?

জি না, খাই নি। ঠিক করে রেখেছি দুপুরে আমি এক বান্ধবীর বাসায় খাব। ওর নাম রূপা। পুরানা পল্টনে থাকে।

স্যারের সঙ্গে দেখা না করে তো যেতে পারবেন না। এখানেই বরঞ্চ খাবার ব্যবস্থা করি। চাইনিজ রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার আনিয়ে দেই।

জি না। রূপার ওখানে খাব ঠিক করে রেখেছি। ওখানেই যেতে হবে।

কিছুই খাবেন না ?

না। আপনি গোপন কথা আমাকে কী বলতে চান বলে ফেলুন। আমি শুনছি।

গোপন কথা বলতে চাই আপনাকে কে বলল ?

দরজা বন্ধ করা দেখে মনে হলো।

ও আচ্ছা। না, গোপন কথা কিছু নেই, আপনি এমন কেউ না যার সঙ্গে গোপনে কথা বলতে হবে। তবে ইয়ে— কিছু জরুরি কথা অবশ্যি আছে।

বলুন।

আপনি বড় ধরনের একটা সমস্যা সৃষ্টি করেছেন।

কী রকম ?

সিগারেট খাবেন ? সিগারেট দেব ?

দিন।

আমি সিগারেট ধরালাম। ম্যানেজার সাহেব সিগারেট খান না— অন্যকে বিলিয়ে বেড়ান।

হিমু সাহেব!

জি।

আপনি একটা বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। স্যারের কত বিশাল প্রপার্টি আপনি জানেন না। আমি কিছুটা জানি, পুরোটা না। প্রপার্টির ওয়ারিশান হচ্ছে উনার মেয়ে। স্যারের শরীরের অবস্থা যা তাতে এই প্রপার্টির সুষ্ঠু লেখাপড়া এখনই হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু স্যার কিছুই করছেন না। আপনার জন্যেই করছেন না।

আমার জন্যে করছেন না মানে ?

ওই যে স্যারের ধারণা হয়ে গেছে, নিষ্পাপ মানুষের রক্ত পেলে রোগ সারবে। এবং তাঁর বিশ্বাস হয়েছে আপনি একজন যোগাড় করে আনবেন—

চেষ্টা করছি।

যত চেষ্টাই করুন লাভ কিছু হবে না। নিষ্পাপ মানুষের রক্তে ব্লাড ক্যানসার সারে এই জাতীয় গাঁজাখুরিতে আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন না। নাকি করেন ?

কিছুটা করি। মিরাকল বলে একটা শব্দ ডিকশনারিতে আছে।

আচ্ছা, আপনি তাহলে মিরাকলে বিশ্বাস করেন ?

হুঁ করি।

আপনি মনে করেন যে, একজন নিষ্পাপ মানুষ আপনি ধরে আনতে পারবেন এবং স্যার সুস্থ হয়ে উঠবেন ?

আমি গম্ভীর ভঙ্গিতে বললাম, নিষ্পাপ লোক পাওয়াই মুশকিল। তবে চেষ্টায় আছি। দেখি কী হয়।

হিমু সাহেব! আপনি কি বুঝতে পারছেন স্যারের এই বিশাল প্রপার্টির ওপর অনেক লোক নির্ভর করে আছে ? সব প্রতিষ্ঠান যাতে ঠিকমতো চলতে পারে তার জন্যে বিলি ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

উনাকে বলে বিলি ব্যবস্থা করিয়ে রাখুন।

উনি তা করবেন না। এইজন্যেই আপনার কাছে আমাদের অনুরোধ— আপনি স্যারকে বুঝিয়ে বলবেন।

কী বুঝিয়ে বলব ?

কিছু বুঝিয়ে বলতে হবে না। আপনি শুধু বলবেন যে, নিষ্পাপ মানুষ খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিতে আপনি অপারগ। এতে আপনার লাভ হবে।

কী লাভ হবে ?

মইন খান চুপ করে গেলেন। ভদ্রলোক আমার উপর যথেষ্ট বিরক্ত। একজন অবুঝ শিশুকে বোঝাতে গেলে আমরা যেমন বিরক্ত হই উনিও তেমনি হচ্ছেন। আমি গলার স্বর নামিয়ে বললাম, কী লাভ হবে বলুন ? টাকা-পয়সা পাব ?

যদি চান পাবেন।

কত টাকা দেবেন ?

ম্যানেজার সাহেব হতাশ ভঙ্গি করে চুপ করলেন। মনে হচ্ছে তিনি হাল ছেড়ে দিয়েছেন। আমি আবারো বললাম, কত টাকা দেবেন তা তো বললেন না।

কত টাকা চান আপনি ?

আপনারা কত টাকা দিতে পারেন সেটা জানা থাকলে বা সেটা সম্পর্কে আমার একটা ধারণা থাকলে চাইতে সুবিধা হতো। ধরুন, আপনারা মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন আমাকে এক কোটি টাকা দেবেন, আমি বোকার মতো চাইলাম এক হাজার টাকা....

এক কোটি টাকা যে কত টাকা সে সম্পর্কে আপনার কি কোনো ধারণা আছে ? এক এর পেছনে কটা শূন্য বসালে এক কোটি টাকা হয় আপনি জানেন ?

রেগে যাচ্ছেন কেন ?

রাগছি না। আপনার বোকামি দেখে হাসছি। একজন অসুস্থ মানুষ মরতে বসেছে— আপনি তার এডভানটেজ নিচ্ছেন। আপনার লজ্জা হওয়া উচিত।

আমি কি কোনো এডভানটেজ নিচ্ছি ?

অবশ্যই। এখনো নেন নি, কিন্তু নেবেন। এক বেকুবকে ধরে নিয়ে এসে বলবেন— এই নিন আপনার পুণ্যবান মানুষ। তার শরীর থেকে দুতিন ব্যাগ রক্ত নেয়া হবে এবং সেই রক্ত আপনি নিশ্চয় বিনামূল্যে দেবেন না। নিশ্চয় দাম নেবেন। নেবেন না ?

হ্যাঁ, নেব।

কত নেবেন ?

পবিত্র রক্তের অনেক দাম মইন সাহেব।

কত সেই দাম সেটাও শুনে রাখি।

আরেকটা সিগারেট দিন। চা খাওয়ান, তারপর বলব। আর শুনুন ভাই, আপনি এত রাগ করছেন কেন ? সম্পত্তি ভাগাভাগি হোক বা না হোক আপনার তো কিছু যায় আসে না। আপনি যেই ম্যানেজার আছেন সেই ম্যানেজারই থাকবেন। এমন তো না যে, আপনি ইয়াকুব আলি সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করছেন। সম্পত্তি ভাগাভাগি করলে আপনার লাভ আছে।

চুপ করুন।

আচ্ছা চুপ করলাম।

মাইন খান গম্ভীরমুখে বের হয়ে গেলেন। আমার জন্যে চা আনতে গেলেন, এ রকম মনে হলো না। আমি চেয়ারে পা তুলে আরাম করে বসলাম। মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ একা একা বসে থাকতে হবে। ম্যানেজার সাহেব এখন আর আমাকে সঙ্গ দেবেন না। আশ্চর্য, ম্যানেজার সাহেব নিজেই ট্রে হাতে ঢুকলেন।

নিন হিমু সাহেব, আপনার চা। খালি পেটে খাবেন না— মাখন মাখানো ক্রেকার আছে। ক্রেকার নিন।

থ্যাংকস।

এখন বলুন, পবিত্র রক্তের দাম কত ঠিক করে রেখেছেন ?

অনেক দাম।

বুঝতে পারছি অনেক দাম। সেই অনেকটা কত ?

আমি শান্ত গলায় বললাম, সেটা পবিত্র রক্ত শরীরে নেবার আগে ইয়াকুব আলি সাহেবকে বলা হবে।

আগে বলবেন না ?

উঁহুঁ। তবে পবিত্র রক্ত যখন পাওয়া যাবে তখন তাঁর সঙ্গে টার্মস এন্ড কন্ডিশান নিয়ে আলাপ করব।

আপনি শুধু ধুরন্ধর না— মহাধুরন্ধর।

আমি হাসলাম। ম্যানেজার সাহেব বললেন, চা খাওয়া হয়েছে ?

জি।

তাহলে যান, স্যারের সঙ্গে দেখা করুন। স্যারের ঘুম ভেঙেছে। আরেকটা কথা, স্যারের পাশে স্যারের মেয়ে বসে আছে, কাজেই কথাবার্তা খুব সাবধানে বলবেন। এমন কিছুই বলবেন না যাতে ম্যাডাম আপসেট হন।

উনাকে কি এখন ম্যাডাম ডাকেন, আগের বার আপা বলছিলেন।

হ্যাঁ ডাকি। দয়া করে আপনিও ডাকবেন।

উনার নাম কী ?

উনার নাম জানার আপনার দরকার নেই।

ইয়াকুব আলি সাহেব লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁকে একটা সরলরেখার মতো দেখাচ্ছে। এই ক'দিনে শরীর মনে হয় আরো খারাপ করেছে। সব মানুষের ভেতর এক ধরনের জ্যোতি থাকে— সেই জ্যোতি এখন আর তাঁর মধ্যে নেই। তাঁর মাথার কাছে যে মেয়েটি বসে আছে তার সঙ্গে আমার আগেও দেখা হয়েছে। তবে আজ তাকে চেনা যাচ্ছে না। ওইদিন দেখেছিলাম খণ্ডিতরূপে, আজ পূর্ণরূপে দেখছি। মাথায় টাওয়েল বাঁধা নেই। তার মাথাভর্তি চুল ঢেউয়ের মতো নেমে এসেছে। পানির রঙ কালো হলে কেমন দেখাত তা মেয়েটির চুল দেখলে কিছুটা অনুমান করা যায়। আমি গভীর বিস্ময় নিয়ে তার চুলের দিকে তাকিয়ে আছি। ইয়াকুব সাহেব বললেন, বোসো হিমু।

আমি বসলাম কিন্তু মেয়েটির চুল থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলাম না। ইয়াকুব সাহেব বললেন, কাউকে পেয়েছ ?

জি পেয়েছি। বেশ কটা নাম পাওয়া গেছে। এখন স্ক্রুটিনি পর্যায়ে আছে। এদের ভেতর থেকে স্ক্রুটিনি করে একজন সিলেক্ট করব।

গুড।

আপনি আরো কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরুন।

ধৈর্য ধরেই আছি।

আপনার স্ত্রীকে কি স্বপ্নে আরো দেখেছেন ?

গতকালই দেখলাম। রাত তিনটার দিকে।

কী বললেন ?

সেই আগের কথা বলল— পুণ্যবান মানুষের রক্ত। আমি তাকে বলেছি, খোঁজা হচ্ছে। শিগগিরই পাওয়া যাবে।

আপনি উনাকেই কেন বলেন না খুঁজে বের করে দিতে। ব্যাপারটা উনার জন্য নিশ্চয়ই সহজ।

আমি ভেবেছিলাম তাকে বলব। তাকে আমার অনেক কিছুই জিজ্ঞেস করার আছে। আমি একটা খাতায় লিস্টি করে রেখেছি কী কী জিজ্ঞেস করব। মৃত্যুর পরের জগতটা কেমন ? সেখানকার দুঃখ-বেদনা কেমন ? কিছুই জিজ্ঞেস করা হয় না। আসলে বাস্তবের জগতটা মানুষের অধীন। স্বপ্নের জগৎ মানুষের অধীন না। স্বপ্নের জগতের নিয়ন্ত্রণ অন্য কারো হাতে...

উনি খুব আগ্রহ নিয়ে কথা বলছেন। আমার উচিত তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকা। কিন্তু আমি বারবারই মেয়েটির চুলের দিকে তাকাচ্ছি। এত সুন্দর চুল কারোর থাকা উচিত নয়। এতে মানুষের দৃষ্টি তার চুলের দিকেই যাবে। তাকে কেউ ভালোমতো দেখবে না।

হিমু!

জি স্যার।

তোমার মিশন শেষ হতে আর কতদিন লাগবে বলে মনে হয় ?

বেশি হলে এক সপ্তাহ।

এই এক সপ্তাহ টিকে থাকলে হয়— শরীর দ্রুত খারাপ করছে। মৃত্যু শরীরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। বিন্দু হয়ে ঢুকেছে। বিন্দু থেকে তৈরি হয়েছে বৃত্ত। সেই বৃত্ত এখন আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিতে শুরু করেছে। আসলে, আসলে...

আসলে কী ?

ইয়াকুব আলি সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, কী বলতে চাচ্ছিলাম ভুলে গেছি।

স্যার, আমি কি এখন উঠব ?

আচ্ছা যাও। আমি ম্যানেজারকে বলে দিয়েছি, তোমার যা যা লাগবে ওকে বলবে। হি উইল টেক কেয়ার অব ইট। তোমার বোধহয় সার্বক্ষণিক একটা গাড়ি দরকার। আমি বলে দিচ্ছি...

গাড়ির স্যার প্রয়োজন নেই।

অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কত জায়গায় যেতে হবে। মিতু মা, তুই হিমুর সঙ্গে যা। ম্যানেজারকে বলে দে।

মিতু উঠে দাঁড়াল। এই মেয়েটার নাম তাহলে মিতু। বেশ সহজ নাম। আমি ভেবেছিলাম আরো কঠিন কোনো নাম হবে। প্রিয়ংবদা টাইপ কিছু।

আমি এবং মিতু সিঁড়ি দিয়ে নামছি। মিতু আমার পাশে পাশে নামছে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা বা নামার সময় মেয়েরা কখনো পাশাপাশি হাঁটে না। তারা হয় আগে আগে যায়, নয়তো যায় পেছনে পেছনে।

হিমু সাহেব!

জি ম্যাডাম।

মিতু থমকে দাঁড়িয়ে বলল, ম্যাডাম বলছেন কেন ?

ম্যানেজার সাহেব আপনাকে ম্যাডাম বলতে বলেছেন। তাছাড়া ম্যাডাম বলাটাই তো শোভন। আপনাকে মিতু ডাকলে আপনার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না।

মিতু বলল, আমার চুলগুলো মনে হয় আপনার খুব পছন্দ হয়েছে। বারবার চুলের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

আপনার চুল খুব সুন্দর।

হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে চান ? ছুঁয়ে দেখতে চাইলে পারেন। কিছু কিছু সৌন্দর্য আছে যা অনুভব করতে হলে স্পর্শ করতে হয়।

ছুঁয়ে দেখব ?

দেখুন। এতে আমার অস্বস্তিও লাগবে না কিংবা গা ঘিনঘিনও করবে না। কারণ এই চুল নকল চুল। আমি মাথায় উইগ পরেছি।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। নকল চুল হাত দিয়ে দেখার কোনো আগ্রহ বোধ করছি না। সুন্দর একটা মেয়ে, তার মাথার চুলও নিশ্চয়ই সুন্দর। সে নকল চুল পরেছে কেন ?

হিমু সাহেব।

জি।

ভূমিকম্প হয়েছিল ঠিকই। আগে আগে কীভাবে বললেন ? আপনার টেকনিকটা কী ?

কোনো টেকনিক নেই।

কিছু টেকনিক নিশ্চয়ই আছে।

আমি সহজ গলায় বললাম, নিম্নশ্রেণীর প্রাণী, যেমন ধরুন, কুকুর বেড়াল এরা ভূমিকম্পের ব্যাপার আগে আগে টের পায়। আমিও বোধহয় নিম্নশ্রেণীর প্রাণী।

মিতু কঠিন গলায় বলল, আমার নিজেরও তাই ধারণা।

আমাকে প্রায় হতভম্ব করে মিতু নেমে যাচ্ছে। এবার সে যাচ্ছে আগে আগে, আমি পেছনে পেছনে। মেয়েদের ধর্ম সে এখন পালন করছে।

ম্যানেজার সাহেব চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এসি বসানো শেভ্রলেট। আগামী সাতদিন এই গাড়ি সারাক্ষণ আমার সঙ্গে থাকবে। গাড়ির ড্রাইভার আমার চেনা— তার গাড়ির ভেলভেটের সিটই আমি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। সেই সিট কভারই বদলানো হয়েছে। পুরো গাড়ির সিট কভার বদলানো। ঝকঝকে কমলা রঙের সিট কভারে সুন্দর লাগছে।

ড্রাইভার ভীতমুখে বলল, কোথায় যাব স্যার ?

যেদিকে ইচ্ছা চালাতে থাকুন। আমি যখন বলব, স্টপ, তখন শুধু থামবেন।

যেদিকে মন চায় সেইদিকে চালাব ?

হুঁ।

বিস্মিত এবং ভীত ড্রাইভার গাড়ি চালাতে শুরু করেছে। আমি গাড়ির সিটে গা এলিয়ে আরামে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছি। মনে হচ্ছে এই জীবনটা গাড়িতে গাড়িতে কাটিয়ে দিতে পারলে মন্দ হতো না।

ড্রাইভার ঠিক স্বস্তি পাচ্ছে না। তাকে আপনি আপনি করে বলাতেও সে বোধহয় খানিকটা ভড়কে গেছে। বারবার মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকাচ্ছে। ব্যাকভিউ মিরর খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করল। অর্থাৎ মিরর এমনভাবে সেট করল যেন ঘাড় না ঘুরিয়েই সে আমাকে দেখতে পায়।

ড্রাইভার সাহেব!

জি স্যার।

আপনার নাম কী ?

আমার নাম স্যার ছামছু।

ভালো। খুব সুন্দর নাম, সামছু হলে ভালো হতো তবে ছামছুও খারাপ না। আগের বার আপনার নাম জানা হয় নি। এবার জেনে নিলাম।

স্যার, আমারে তুমি কইরা বলবেন। আর ড্রাইভার সাব বইল্যা লজ্জা দিবেন না। আর আফনের সাথে বিয়াদবি কিছু করলে মাফ দিয়া দিবেন।

আচ্ছা ঠিক আছে, ছামছু। ভালোমতো চালাও। আমি একটু ঘুমিয়ে নিই।

যে দিকে ইচ্ছা সেদিকে চালামু স্যার ?

হুঁ। খানাখন্দ এড়িয়ে চালাবে। ঘুমোচ্ছি তো, হঠাৎ ঝাঁকুনি খেলে ঘুম ভেঙে যাবে।

জি আচ্ছা স্যার।

ছামছু গাড়ি চালাচ্ছে। আমি ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করছি। ছামছু উদ্দেশ্যবিহীনভাবে গাড়ি চালাচ্ছে না। আমি জানি, সে এখন যাচ্ছে তার বাসার দিকে। বাসার খুব কাছাকাছি যাবার পর সে বলবে, এখন কোথায় যাব স্যার? তার আগে বলবে না। এই পৃথিবীতে মানুষের একমাত্র গন্তব্য তার ঘর।

ছামছু মৃদু গলায় বলল, গান দিমু স্যার?

তোমার নিজের গান শুনতে ইচ্ছা হলে দিতে পারো। আমার লাগবে না।

আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভেঙে দেখি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার ছামছু তার সিটে চুপচাপ বসা। আমাকে তাকাতে দেখেই সে বলল, এখন কোন দিকে যামু স্যার?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, তোমার বাসা কি খুব কাছে?

জি স্যার। সামনের গলির দুইটা বাড়ির পরে।

তাহলে তুমি বরং এক কাজ করো— বাসা থেকে একটু ঘুরে আসো। ছেলেমেয়েদের দেখে আসো। ততক্ষণে আমি একটু ঘুমিয়ে নিই।

ছামছু বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে।

এই পৃথিবীতে সবচে' সুন্দর জিনিস কী? মানুষের বিস্মিত চোখ। আমার ধারণা, সৃষ্টিকর্তা মানুষের বিস্মিত চোখ দেখতেই সবচে' পছন্দ করেন, যে কারণে প্রতিনিয়ত মানুষকে বিস্মিত করার চেষ্টা তিনি চালিয়ে যান। যাদের তিনি অপছন্দ করেন তাদের কাছ থেকে বিস্মিত হবার ক্ষমতা কেড়ে নেন। তারা কিছুতেই বিস্মিত হয় না।

সত্যি বাসায় যামু স্যার?

হ্যাঁ যাও।

ছামছু চলে গেছে। আমি আগের মতোই গা ছড়িয়ে শুয়ে আছি। তন্দ্রা তন্দ্রা ভাব। শরীর জুড়ে আলস্য। সন্ধ্যাবেলা রূপার কাছে যাবার ইচ্ছা ছিল। অনেকদিন রূপাকে দেখা হয় নি।

বড় খালুর বাসায়ও যাওয়া দরকার।

খুঁজে বের করা দরকার পূর্ত মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্টকে, নাম হলো— মুনশি বদরুদ্দিন তালুকদার।

অনেক কাজ। কিন্তু সব কাজ ছাপিয়ে ঘুমানোর কাজটাই আমার কাছে প্রধান বলে মনে হচ্ছে। এই গাড়ির জানালার কাচ মনে হয় রঙিন। বাইরের পৃথিবীটা অনেক বেশি সুন্দর লাগছে। চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে মজার কোনো খেলা খেলছে। কী একটা সাদা বলের মতো জিনিস একজন আরেকজনের গায়ে

ছুড়ে দিচ্ছে। যার গায়ে ছুড়ে দেয়া হচ্ছে সে আনন্দে চিৎকার করছে। যে ছুড়ে মারছে সেও আনন্দে চিৎকার করছে। কত আনন্দই না এই ভুবনে ছড়ানো।

ভালোমতো তাকিয়ে দেখি গোল সাদামতো জিনিসটা একটা কুকুরছানা। সে এই বিচিত্র খেলার কিছুই বুঝতে পারছে না। তার চোখ আতঙ্কে নীল হয়ে আছে। সে জেনে গেছে তার কপালে আছে অবধারিত মৃত্যু। সে অপেক্ষা করছে মৃত্যুর জন্যে।

আমি হাত উঁচিয়ে ছেলেগুলোকে ডাকলাম, এই এই—

ছেলেরা কঠিন মুখ করে এগোচ্ছে। কুকুরছানাটা একজনের হাতে। ছানাটার বুক কামারের হাপরের মতো উঠানামা করছে।

তোরা এই বাচ্চাটাকে আমার কাছে বিক্রি করবি?

না।

আচ্ছা তাহলে চলে যা। বিক্রি করলে আমি কিনব।

না, বেচব না।

তাহলে চলে যা।

ছেলেরা চলে গেল। আমি দেখতে পাচ্ছি খেলা আর জমছে না। তারা গোল হয়ে আলাপ করছে। মনে হচ্ছে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। একদল বিক্রি করতে চায়, একদল চায় না। একটা ছেলে এগিয়ে আসছে। তাকে মনে হয় নিগোসিয়েশনের জন্য পাঠানো হচ্ছে—

কী রে, বিক্রি করবি?

হুঁ।

চাস কত?

পাঁচ শ' টেকা।

কমাবি না?

না।

দেখ কিছু কমানো যায় কি না।

দলের অন্যরাও এগিয়ে আসছে। আসন্ন ব্যবসার সম্ভাবনায় তারা উল্লসিত। সবার চোখ চকচক করছে। আমি বললাম, পাঁচশ' টাকা এই কুকুরছানার দাম হয় না তাও হয়তো কিনতাম, কিন্তু লেজটা কালো। কালো লেজের কুকুরের সাহস থাকে না।

এইটা বিদেশী কুত্তা।

কে বলল বিদেশী?

দেইখ্যা বোঝা যায়।

দেখে বোঝা গেলেও এত দাম দিয়া কিনব না। কম কত নিবি ?

এক পয়সাও কম নাই।

তোরা তো ব্যবসা ভালো শিখেছিস।

আপনে কত দিবেন ?

আমি দশ টাকা দিতে পারি। দশ টাকার এক পয়সা বেশি হলেও নিব না।

ছেলেগুলি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। কোথায় পাঁচ শ' কোথায় দশ! তারা মনে হয় এত হতাশ এর আগে কখনো হয় নি।

কী রে, দিবি দশ টাকায় ?

না।

তাহলে চলে যা। দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?

আমি চোখ বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়লাম। আমি জানি এরা যাবে না। এরা দশ টাকাতেই কুকুরটা বিক্রি করবে। আমি একটা পশুর জীবন কিনব দশ টাকায়।

কুকুরটা আমার পাশে বসে আছে। মাঝে মাঝে মাথা তুলে আমাকে দেখছে। পশুদের ভেতর কি কৃতজ্ঞতাবোধ আছে ? থাকার কোনো কারণ নেই, কিন্তু এ এত নরম চোখে কেন আমাকে দেখছে ? আমি বললাম, আয় আয়।

সে লাফ দিয়ে আমার কোলে উঠল। কোলে উঠেই কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তার অবচেতন মন বলছে, তার আর কোনো ভয় নেই।

কী সুন্দর এই কুকুরছানা! সাদা উলের বলের মতো। দেখলেই হাত দিয়ে ছুঁতে ইচ্ছা করে। সে বড় হবে পথে পথে। খাবারের আশায় হোটেলের চারপাশে ঘুরঘুর করবে। একদিন হোটেলের কোনো কর্মচারী তার গায়ে গরম মাড় ফেলে দেবে।

অনেক অনেক শতাব্দী আগে এই পশু মানুষের সঙ্গে অরণ্য ছেড়ে চলে এসেছিল। আজ আর তার অরণ্যে ফিরে যাবার পথ নেই। তাকে আশ্রয়ের জন্যে অনুসন্ধান করে যেতে হবে। আধুনিক মানুষ সেই আশ্রয় আজ আর তাকে দেবে না। কুকুরের প্রয়োজন তার ফুরিয়ে গেছে। খেলার জন্যে আজ আর তার কুকুর-বেড়ালের প্রয়োজন নেই। তার আছে কম্পিউটার।

স্যার কুত্তা কই পাইলেন ?

ড্রাইভার ফিরে এসেছে। পান খাচ্ছে। পানের রসে মুখ লাল। হাতে করে একটা পান সে আমার জন্যেও নিয়ে এসেছে।

কুত্তা কই পাইলেন স্যার ?

কিনলাম।

নেড়ি কুত্তা পয়সা দিয়া কিননের জিনিস না।

দেখতে সুন্দর।

দেখতে সুন্দর জিনিসের কোনো উবগার নাই।

উচ্চশ্রেণীর ফিলসফি করে ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিল। খুশি খুশি গলায় বলল, স্যার কই যামু ?

সেক্রেটারিয়েটে চলো। দেখি মুনশি বদরুদ্দিনকে পাওয়া যায় কি না।

সেক্রেটারিয়েটে ঢোকার আমার পাস নেই। তবে আজ পাস লাগবে না। এত দামি গাড়িকে কেউ আটকায় না।

মুনশি বদরুদ্দিনকে আজো পাওয়া গেল না। তার মেয়ে অসুস্থ, সে নাকি মেয়েকে নিয়ে হাসপাতালে গেছে। আমি বললাম, এসেছি যখন চা খেয়ে যাই। দু'কাপ চা আনানোর ব্যবস্থা করুন। আমার জন্যে এক কাপ, আমার কুকুরটার জন্যে এক কাপ। সেও চা খায়।

অফিসের সব কটা লোক এমনভাবে তাকাচ্ছে যাতে মনে হয় এরা আজ আমাকে সহজে ছাড়বে না। দরজা বন্ধ করে শক্ত মার দেবে। মার দিলে দেবে—কী আর করা! আমি বেশ আরাম করেই বসলাম। আমার কোলে কুকুরছানা। এর একটা নাম দেয়া দরকার। দুই অক্ষরের নাম। কুকুরের নাম দুই অক্ষরের বেশি হলে ভালো লাগে না।

কই ভাই চায়ের কথা বলছেন ?

আমাকে অবাক করে দিয়ে একজন সত্যি সত্যি চায়ের কথা বলল। এরা আমাকে মারার সাহস পাচ্ছে না। মনে হয় কিছুটা ভয়ও পাচ্ছে। অসৎ মানুষ ভীরু প্রকৃতির হয়।

চা এসেছে।

শুধু চা না। চায়ের সঙ্গে বিসকিট। একজন একটা সিগারেটও বাড়িয়ে দিল। চা খেতে খেতে আজকের প্রোগ্রাম ঠিক করে নিলাম— লালবাগ থানায় যাব। সেকেন্ড অফিসারকে পাওয়া যায় কি না দেখব। ফার্মগেটে একলেমুর মিয়াকে খুঁজে বের করব। তার মেয়েটা কি ফিরে এসেছে ?

রূপার সঙ্গে কথা বলতে হবে। কথা বলব, নাকি চলে যাব তাদের বাড়িতে ?

লালবাগ থানার সেকেন্ড অফিসারকে পাওয়া গেল না। তিনি বদলি হয়ে গেছেন মুন্সীগঞ্জে। লালবাগ থানার ওসি সাহেব আমাকে চিনতে পারলেন। চিনতে না

পারার কোনো কারণ নেই— তিনি তাঁর থানা হাজতে আমাকে এক সপ্তাহের মতো আটকে রেখেছিলেন। আমি ওসি সাহেবের দিকে তাকিয়ে মধুর ভঙ্গিতে বললাম, ঘুস ইদানীং কেমন আসছে স্যার ?

ওসি সাহেব এই কথায় রাগ করলেন না। বরং আনন্দিত গলায় বললেন, বসুন। আপনি আজকাল করছেন কী ?

কিছু করছি না। পবিত্র মানুষ খুঁজছি। আপনার সন্ধানে কোনো পবিত্র মানুষ আছে ?

পবিত্র মানুষ খোঁজার জন্যে তো ভাই পুলিশ ডিপার্টমেন্ট না। আমাদের কাজ অপবিত্র মানুষ নিয়ে। যদি কোনোদিন অপবিত্র মানুষের প্রয়োজন হয়, আসবেন। সন্ধান দেব। আপনার মাথার দোষ এখনো সারে নাই ?

আমি হাসলাম।

বুঝলেন হিমু সাহেব, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে ওষুধপত্র খান। পীর-ফকিরের তাবিজ নেন। ব্রেইন পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেলে বিপদে পড়বেন। মহা বিপদে পড়বেন।

স্যার উঠি ?

আচ্ছা যান। আরেকটা উপদেশ শুনে যান— পুলিশ এভয়েড করে চলবেন। আমি আপনাকে চিনি বলে ছেড়ে দিচ্ছি— অন্যরা তো চিনবে না— মেরে ভর্তা বানিয়ে ফেলবে। টাকি মাছের ভর্তা। খেয়েছেন কখনো টাকি মাছের ভর্তা ?

জি খেয়েছি।

খেতে ভালো না ?

অতি উপাদেয়।

দুপুরে তেমন কোনো কাজ না থাকলে বসে থাকুন। টাকি মাছের ভর্তা দিয়ে ভাত খাবেন। স্ত্রীকে বলেছি টাকি মাছের ভর্তা করতে।

মুরগি খেতে খেতে মুখে অরুচি হয়েছে ?

ওসি সাহেব হো-হো করে হেসে উঠলেন। আমি উঠে পড়লাম। টাকি মাছের ভর্তা খাওয়ার সময় নেই।

আমার ড্রাইভার ছামছু আকাশ থেকে পড়েছে। সে কল্পনাও করতে পারছে না আমি কী করে রাস্তার একটা ফকিরের সঙ্গে বসে ভাত খাচ্ছি। ছামছুকে খেতে ডেকেছিলাম, সে ঘৃণার সঙ্গে প্রস্তাব প্রত্যাখান করে মুখ কালো করে গাড়িতে বসে আছে।

একলেমুর মিয়ার মেয়েটা ফিরে এসেছে। সে খাচ্ছে আমাদের সাথে। মেয়েটা বিচিত্র ধরনের— ভাত ছাড়া আর কিছু খেতে পারে না। কপ কপ করে শুধু ভাত খায়। ভাতের উপর খানিকটা লবণ ছিটিয়ে দিতে হয়। আর কিছু লাগে না।

একলেমুর মিয়া।

জি ভাইজান ?

এই জীবনে পাপ কী কী করেছ ?

প্রত্যেক দিনেই তো পাপ করি ভাইজান। মাইনষের কাছে ভিক্ষা চাই... মাইনষে বিরক্ত হয়। মাইনষেরে বিরক্ত করা মহাপাপ।

এই জাতীয় পাপের কথা বলছি না। বড় পাপ।

পাপের কোনো বড় ছোট নাই। ছোট পাপ, বড় পাপ সবই সমান—।

তাই নাকি ?

জি। তার উপরে দুই কিসিমের পাপ আছে। মনের পাপ, আর শরীরের পাপ। ধরেন আমি একটা জিনিস চুরি করলাম। এইটা হইল শরীরের পাপ। চুরি করছি হাত দিয়া। আবার ধরেন মনে মনে ভাবলাম চুরি করব। এইটা মনের পাপ। চুরি না করলেও মনে মনে ভাবার কারণে পাপ হইল। এই পাপও কঠিন পাপ।

তার মানে কি এই দাঁড়াচ্ছে যে নিষ্পাপ মানুষ পাওয়া যাবে না ?

দুই একজন আছে। তবে পাওয়া জটিল।

তোমার সন্ধানে আছে ?

আছে, আমার সন্ধানে একজন আছে।

যদি দরকার হয় তাকে আমার কাছে এনে দিতে পারবে ?

একলেমুর মিয়া কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, পারমু। আপনে বললেই আইন্যা দিমু।

গুড।

আমি একলেমুর মিয়ার মেয়েটাকে বললাম, এই গাড়ি চড়বি ?

চড়মু।

আয় আমার সঙ্গে।

মেয়ে তৎক্ষণাৎ ভাতের থালা ফেলে উঠে এলো। গাড়ি দেখে তার চোখ কপালে উঠে গেল।

এই গাড়ি আফনের ?

হুঁ। আপাতত আমার। যা ওঠ।

বাপজানরে লইয়া উঠুম। আইজ আমি আর বাপজান গাড়িত কইরা ভিক্ষা করুম।

এটা মন্দ না।

আমি ছামছুকে বললাম, ছামছু গাড়িতে তেল আছে ?

জি স্যার আছে।

এরা দুইজন আজ গাড়িতে করে ভিক্ষা করবে। তুমি এদের ভিক্ষা করতে নিয়ে যাও।

ছামছু তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে তার ছোটখাটো হার্ট অ্যাটাকের মতো হয়েছে। কপাল ঘামছে। সে ক্ষীণ গলায় বলল, গাড়িতে বইস্যা ভিক্ষা করব ?

হুঁ। গ্রামে আমি ফকিরদের ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষা করতে দেখেছি। ঘোড়ায় চড়ে যদি ভিক্ষা করা যায় গাড়িতেও করা যায়। রাত নটা পর্যন্ত তুমি এদের নিয়ে ঘুরবে, তারপর চলে আসবে আমাদের মেসের সামনে, ঠিক সামনে যে গ্রীন ফার্মেসি সেখানে।

জি আচ্ছা স্যার।

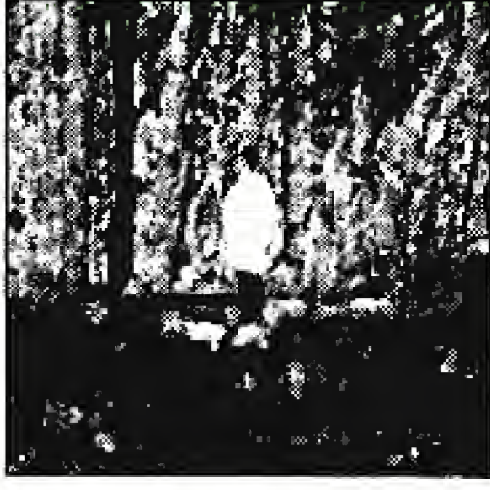
মুখ এরকম করে রেখেছ কেন ছামছু ?

আমার গাড়িতে বইস্যা ভিক্ষা করব, লোকে আমারে ধইরা মাইর দেয় কি না, এইটা নিয়া চিন্তিত আর কিছু না।

চিন্তা করবে না। মনে সাহস রাখ ছামছু।

জি আচ্ছা, সাহস রাখব।

মুখ কালো করে ছামছু গাড়ি স্টার্ট দিল। ছোট মেয়েটা খিলখিল করে হাসছে। এত সুন্দর হাসি অনেক দিন শুনি নি।



রূপা ঘুম-ঘুম গলায় বলল, হ্যালো।

আমি বললাম, কেমন আছ রূপা ?

সে জবাব দিল না। চুপ করে রইল। আমি আবার বললাম, কেমন আছ রূপা ?

রূপার ছোট্ট করে শ্বাস নেবার শব্দ শুনলাম। তারপর পরিষ্কার গলায় বলল, ভালো আছি।

ঘুম-ঘুম গলায় কথা বলছ কেন ?

ঘুমোচ্ছিলাম। ঘুম ভেঙে টেলিফোন ধরেছি, এই জন্যেই ঘুম-ঘুম গলায় কথা।

আজ এত সকাল-সকাল শুয়ে পড়লে যে ? মাত্র দশটা বাজে।

আমার জ্বর, এই জন্যেই সকাল-সকাল শুয়ে পড়েছি।

জ্বর! তাহলে কেন বললে, আমি ভালো আছি ?

ভুল হয়েছে, ক্ষমা করে দাও।

আমি হেসে ফেললাম। রূপা হাসছে না। এমনিতে সে খুব হাসে। কিন্তু টেলিফোনে আমি তাকে কখনো হাসতে শুনি নি।

রূপা!

শুনছি।

তোমার জন্যে একটা উপহার পাঠিয়েছি। কিছুক্ষণের মধ্যে আমার ড্রাইভার উপস্থিত হবে।

তোমার ড্রাইভার মানে ?

কিছুদিনের জন্যে একটা গাড়ি এবং ড্রাইভার পেয়েছি।

শুনে সুখী হলাম।

উপহার পেয়ে আরো সুখী হবে। উপহারটা হলো একটা কুকুরছানা।

তোমার কাছে আমি কি কুকুরছানা কোনোদিন চেয়েছি ?

না।

তাহলে এই রাতদুপুরে কুকুরছানা পাঠাবার অর্থ কী ?

রূপা, তুমি কি রাগ করলে ?

না, রাগ করি নি, তার সঙ্গেই রাগ করা চলে যে রাগের অর্থ বোঝে। রাগ, অভিমান, ঘৃণা, ভালোবাসা এর কোনো মূল্য তোমার কাছে নেই। কাজেই আমি তোমার উপর রাগ করা ছেড়েছি। শুধু রাগ না, অভিমান ঘৃণা, ভালোবাসা কোনো কিছুই আর তোমার জন্যে নেই।

তোমার জ্বর কি খুব বেশি ?

কেন, আমার কথাগুলো কি প্রলাপের মতো লাগছে ?

না। খুব স্বাভাবিক লাগছে, এই জন্যেই জিজ্ঞেস করছি। তোমার জ্বর কত ?

এক শ' দুই পয়েন্ট ফাইভ।

অনেক জ্বর। যাও শুয়ে থাক।

আমি শুয়েই আছি। কথা বলছি শুয়ে শুয়ে।

আর কথা বলতে হবে না, বিশ্রাম করো।

রূপা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আমার বিশ্রাম নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি তোমার নিজের বিশ্রাম নিয়ে ভাবো। আজকাল কী করছ জানতে পারি ?

কিছুই করছি না। ঘুরে বেড়াচ্ছি বলতে পারো।

মিথ্যা কথা বলছ কেন ? আমি তো যতদূর জানি তুমি পবিত্র রক্ত খুঁজে বেড়াচ্ছ।

ও আচ্ছা, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।

পেয়েছ ?

উঁহুঁ। তবে পেয়ে যাব।

তোমাকে একটা কথা বলি, খুব মন দিয়ে শোন— তুমি কোনো একজন ভালো সাইকিয়াট্রিস্টকে তোমার বিখ্যাত মাথাটা দেখাও। প্রয়োজন হলে শক ট্রিটমেন্ট করাও, নয়তো কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যাবে পুরোপুরি দিগম্বর হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছ এবং ট্রাফিক কনট্রোলের চেষ্টা করছ।

তোমার জ্বর কদিন ধরে ?

এই তথ্য জানার তোমার কি কোনো প্রয়োজন আছে ?

না।

তাহলে কেন জিজ্ঞেস করলে ?

কথার পিঠে কথা বলার জন্য।

কথার পিঠে কথা বলার জন্য আর ব্যস্ত হতে হবে না। আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখছি।

এক সেকেন্ড। একটা জরুরি কথা তোমাকে বলা হয় নি। কথাটা হচ্ছে— কুকুরছানাটার একটা নাম আছে। আমিই নামটা দিয়েছি। তুমি যদি নতুন নাম দিতে চাও, দেবে। আর নতুন নাম খুঁজে না পেলে আমারটা রেখে দিতে পারো। বলব নামটা ?

বলো।

মেয়ে কুকুর তো, কাজেই আমি নাম রেখেছি কঙ্কাবতী। আদর করে তুমি ওকে কঙ্কাও ডাকতে পার। কঙ্কা ডাকলেই সে কান খাড়া করে।

রূপা খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখল। গ্রীন ফার্মেসির ছেলেটা বিরক্ত মুখে বলল, কথা শেষ হয়েছে ? এতক্ষণ কেউ টেলিফোনে কথা বলে ? কত জরুরি কল আসতে পারে...

আমি হাসলাম। ছেলেটি আরো বিরক্ত হলো। আমি বললাম, ভাই, আরেকটা কল করতে হবে। ভয়ানক জরুরি। না করলেই নয়। কুড়ি মিনিটের বেশি এক সেকেন্ডও কথা বলব না।

আপনি কি ঠাট্টা করছেন ?

না, ঠাট্টা করছি না।

আমি এখন দোকান বন্ধ করে বাসায় যাব। যাত্রাবাড়িতে থাকি, আর দেরি করলে বাস পাব না।

বাসের জন্যে চিন্তা করতে হবে না। আমার গাড়ি আছে। গাড়ি পৌঁছে দেবে।

গাড়ি আছে ?

অবশ্যই গাড়ি আছে। এসি বসানো গাড়ি।

কেন এইসব চাল মারেন ?

তার কথার জবাব দেয়ার আগেই আমার গাড়ি এসে উপস্থিত হলো। গ্রীন ফার্মেসির ছেলে চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছে। আমি বললাম, ভাই, করব একটা টেলিফোন ?

করুন।

আরেকটা কথা বলে রাখি— এর মধ্যে যদি আপনার গাড়ির কখনো দরকার হয়— ছেলেমেয়ে নিয়ে চিড়িয়াখানায় যাবেন বা এই জাতীয় কিছু— তাহলে আমাকে বলবেন। গাড়ি এখন আর কোনো সমস্যা না।

টেলিফোন করলাম বড় খালার বাসায়। বড় খালা টেলিফোন ধরলেন।

বড় খালা, স্লামালিকুম।

কে, হিমু ?

জি।

হারামজাদা, জুতিয়ে আমি তোর বিষদাঁত ভাঙব।

কী হয়েছে খালা ?

তোর এত বড় সাহস! ফিচকেল কোথাকার!

খালা, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না বলে অস্বস্তি বোধ করছি— ব্যাপারটা কী ?

গালাগালি করার আগে ব্যাখ্যা করো কেন গালাগালি করছ।

তুই কি এর মধ্যে তোর খালুর অফিসে গিয়েছিলি ?

হুঁ।

অফিসে গিয়ে তাকে বলেছিস যে সে পুণ্যবান লোক ?

জি খালা। আমি একটা লিস্ট করেছি। লিস্টে তাঁর নাম আছে।

তোর কথা শুনে ঐ গাধা পুণ্যবান সাজার চেষ্টা করছে। আমাদের এই বাড়ি সে এতিমখানা বানানোর জন্যে দিয়ে দিতে চায়।

বলো কী!

এত কষ্টের পয়সার বাড়ি, এটা নাকি হবে এতিমখানা! এতিমখানা আমি তার পাছা দিয়ে ঢুকায়ে দেব।

খালা, প্লিজ, আরেকটু ভদ্র ভাষা ব্যবহার করো।

হারামজাদা, ভদ্র ভাষা আবার কী রে ? গাধা পুণ্যবান সাজে। উকিল-মোক্তার নিয়ে বাসায় উপস্থিত। আমি ভাবলাম কী না কী, পরে শুনি এই ব্যাপার। আমাকে ডেকে বলে— সুরমা, তুমি কিন্তু সাক্ষী। সাক্ষী আমি বুঝায়ে দিয়েছি।

মারধর করেছ ?

ইয়ারকি করিস না হিমু। ইয়ারকি ভালো লাগছে না।

খালুজানকে দাও। কথা বলি।

ওকে দেব কোত্থেকে ? ও কি বাসায় আছে ? জুতিয়ে বের করে দিয়েছি না ? স্যান্ডেল-পেটা করেছি।

স্পঞ্জ স্যান্ডেল, না চামড়া ?

হারামজাদা, রসিকতা করিস না। তোকেও জুতা-পেটা করব।

খালুজানকে কখন বাড়ি থেকে বের করলে ? আজ ?

হ্যাঁ, সন্ধ্যাবেলা। উকিল-মোক্তার সব নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে ঘর থেকে বের হয়েছে। মোক্তার ব্যাটা ফাইল নিয়ে হুড়মুড় করে রাস্তায় গড়িয়ে পড়েছে।

তুমি কি সত্যি সত্যি স্যান্ডেল-পেটা করেছ ?

অবশ্যই।

রাখি খালা ?

শোন হিমু, গাধাটার সঙ্গে তোর যদি দেখা হয় তাহলে গাধাকে বলবি সে যেন আর ত্রিসীমানায় না আসে...

জি আচ্ছা, আমি বলব। তবে বলার দরকার হবে বলে মনে হয় না।

কত বড় সাহস! আমার জমি, আমার বাড়ি সে দান করে দিচ্ছে, আর আমাকে বলছে সাক্ষী হতে। মদ খেয়ে খেয়ে মাথার বারটা বেজে গেছে সেই খেয়াল নেই।

খুব খাচ্ছেন বুঝি ?

অফিসে গিয়েছিলি, কিছু টের পাস নি ? রাত-দিন তো ওর উপরই আছে। গাধার চাকরিও চলে গেছে।

বলো কী!

অনেক আগেই যাওয়া উচিত ছিল।

আমাকে টেলিফোন ছাড়তে হলো না। আপনা আপনি লাইন কেটে গেল। আমি ফ্যাকাসে ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করলাম। ভালো যন্ত্রণায় পড়া গেছে। আমার ধারণা, মেসে ফিরে দেখব বড় খালু বসে আছেন। আমার ইনট্যুশন তাই বলছে। কিছুদিন পালিয়ে থাকার জন্যে আমার আস্তানা সর্বোত্তম। গ্রীন ফার্মেসির ছেলেটাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে দু'প্যাকেট ডানহিল সিগারেট কিনলাম। বড় খালুর এই হচ্ছে ব্র্যান্ড। আমার ধারণা, মেসে পা দেয়ামাত্র বড় খালু বলবেন, হিমু, সিগারেট এনে দে।

মেসে ফিরলাম।

আমার ঘরের দরজা খোলা। ঘর অন্ধকার। খাটের উপর কেউ একজন শুয়ে

আছে। আমি ঘরে ঢুকলাম। পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে করতে বললাম, বড় খালু, আপনার সিগারেট। ডানহিল।

বড় খালু জড়ানো গলায় বললেন, থ্যাংকস। তোর এখানে দু-একদিন থাকব। অসুবিধা আছে ?

আমার কোনো অসুবিধা নেই। আপনি থাকতে পারবেন কিনা কে জানে।

নিজের বাড়ি ছাড়া অন্য যে কোনো জায়গায় আমি থাকতে পারি। নিজের বাড়ি ছাড়া অন্য যে কোনো জায়গাই আমার জন্যে স্বর্গ— দি হেভেন।

কিছু খেয়েছেন ?

না।

চলুন আমার সঙ্গে। হোটেলের খাবার খেতে অসুবিধা নেই তো ?

না।

বড় খালু উঠে দাঁড়িয়েছেন, তবে দাঁড়ানোর ভঙ্গি শিথিল। বোঝাই যাচ্ছে প্রচুর মদ্যপান করেছেন। মুখ থেকে ভকভক করে কুৎসিত গন্ধ আসছে। কথাবার্তা পুরো এলোমেলো।

হিমু!

জি।

তোর এই মেসের ম্যানেজার এসেছিল। তোর নাকি আজই মেস ছেড়ে দেবার কথা ?

হুঁ।

আমি রিকোয়েস্ট করে আর এক সপ্তাহ টাইম এক্সটেনশান করেছি।

ভালো করেছেন।

এক সপ্তাহ পর যদি বের করে দেয়, দুজন একসঙ্গেই বের হয়ে যাব। কী বলিস ?

সেটা মন্দ হবে না।

শীতকাল হওয়ায় মুশকিল হয়েছে। গরমকাল হলে পার্কের বেঞ্চিতে আরাম করে ঘুমানো যেত।

হুঁ।

তুই শুধু হুঁ হাঁ করছিস কেন ? কথা বল। বি হ্যাপি। বুঝলি হিমু, তোর এই মেসের লোকজন খুবই মাইডিয়ার। এক ভদ্রলোক তোর ঘরের তালা অনেক যন্ত্রণা করে খুলে দিয়েছেন। একজন এসে তাস খেলার জন্য ইনভাইট করলেন।

ভালো তো।

তোদের এখানে কাজের মেয়েটা যে আছে, কী যেন তার নাম ?

ময়নার মা ?

আরে ধুৎ! ময়না হলো তার মেয়ের নাম। ওর নিজের নাম কী ?

নাম জানি না খালু।

মনে পড়েছে, ওর নাম হলো কইতরী। সুন্দর না নামটা ?

হ্যাঁ, সুন্দর।

কইতরী আমাকে চা এনে দিল। অনেকক্ষণ গল্প করলাম কইতরীর সঙ্গে। অসাধারণ মহিলা। গরিব ঘরে জন্মেছে বলে সে হয়েছে ঝি। বড়লোকের ঘরে জন্মালে ইউনিভার্সিটির অঙ্কের টিচার হতো...।

বড় খালুকে হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামালাম। তিনি দেখি এক একবার হুমড়ি খেয়ে গায়ে পড়ে যাচ্ছেন। বেতাল অবস্থা।

বড় খালু, বমি-টমি হবে না তো ?

তুই কি পাগল-টাগল হয়ে গেলি ? আমি কি এ্যামেচার ? আমি হলাম প্রফেশনাল পানকারী। আমার কিছুই হবে না।

না হলেই ভালো।

বুঝলি হিমু, ঐ কইতরী মেয়েটাকে আমার পছন্দ হয়েছে। I like him.

Him না বড় খালু, her.

ঠিকই বলেছিস, her, I like her, Exceptional lady.

তাই নাকি ?

তোর খালাকে একটা শিক্ষা দেয়ার জন্যে কইতরীকে বিয়ে করে ফেললে কেমন হয় ? তাহলে তোর খালা সমাজে মুখ দেখাতে পারবে না। উচিত শিক্ষা হবে। সবাই বলবে— ছিঃ ছিঃ! ঝি বিয়ে করে ফেলেছে। হো-হো-হো। হি-হি-হি।

আপনার অবস্থা তো কাহিল বলে মনে হচ্ছে।

তোর খালার অবস্থা আরো কাহিল করে ফেলব। একেবারে কাহিলেস্ট করে দেব। কাহিল-কাহিলার-কাহিলেস্ট, তখন সে বুঝবে হাউ মেনি রাইস, হাউ মেনি পেডি। হি-হি-হি।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। ভালো যন্ত্রণায় পড়া গেল।

হিমু!

জি।

একটা কী যে জরুরি কথা তোকে বলা দরকার, মনে পড়ছে না। ফরগটেন।

মনে পড়লে বলবেন।

খুবই জরুরি ব্যাপার। এখানে দাঁড়া। দাঁড়ালে মনে পড়বে।

মাতাল মানুষের কাছে সবই জরুরি। তারা অতি তুচ্ছ ব্যাপারকে আকাশে তোলে। আমি বড় খালুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তাঁর কিছু মনে পড়ছে না।

দাঁড়িয়ে থাকলে মনে পড়বে না। বরং আমরা হাঁটি। হাঁটলে ব্রেইন ঝাঁকুনি খাবে, তাতে যদি মনে আসে।

এটা মন্দ না।

তাঁকে নিয়ে হোটেলে ঢোকার আগে কিছুক্ষণ হাঁটলাম। তিনি হাঁটার সময় ইচ্ছে করে বেশি বেশি মাথা ঝাঁকালেন— তাতেও লাভ হলো না।

হোটেলে খেতে বসে তাঁর মনে পড়ে গেল। আনন্দিত গলায় বললেন, মনে পড়েছে। আলেয়া এসেছিল তোর কাছে। চিনেছিস তো? সম্পর্কে তোর খালা হয়। তার বোনের মেয়েটাকে নিয়ে এসেছিস— খুকি নাম। পরীর মতো মেয়ে।

কী জন্যে এসেছিলেন?

খুকির বড় মেয়েটাকে তারা খুঁজে পাচ্ছে না। দুদিন হলো বাসা থেকে উধাও। তোর কাছে এসেছে, তুই যদি কিছু বলতে পারিস?

আমি কী করে বলব?

আমিও সেই কথাই ওদের বললাম। আমি বললাম— হিমু বলবে কী করে? ও কি ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের লোক? আলেয়া কিছুতেই মানবে না। আলেয়ার ধারণা, তুই চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ধ্যান করলেই বলতে পারবি মেয়েটা কোথায় আছে। হা-হা-হা।

মেয়েটার নাম কি পলিন?

হুঁ। তুই চিনিস নাকি?

চিনি।

ধ্যান করে বলতে পারবি মেয়েটা কোথায়?

না। ধ্যান কী করে করতে হয় জানি না।

খুব ইজি। আমি তোকে শিখিয়ে দেব। প্রথমে ঘরটা অন্ধকার করবি। তারপর পদ্মাসন হয়ে বসবি। খালি গা। সবচে' ভালো হয় সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে বসলে... চোখ পুরোপুরি বন্ধও না, খোলাও না...

বড় খালু খুব আগ্রহ নিয়ে ধ্যানের কৌশল বলছেন। আমি শুনছি।

ধ্যান করলে সব পাওয়া যায় রে হিমু, সব পাওয়া যায়। ধ্যান কর। ধ্যান।

ধ্যান করব! রেস্টুরেন্টে ধ্যান সম্ভব না। বাসায় ফিরেই করব।

রেস্টুরেন্টেও সম্ভব। এই দ্যাখ আমি করছি। আমাকে দেখে শিখে নে।

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে ধ্যান করতে লাগলেন। এবং ত্রিশ সেকেন্ডের মাথায় কাটা তালগাছের মতো মেঝেতে পড়ে গেলেন। উঠলেন না। ওঠার অবস্থা নেই। তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।



আকাশ মেঘলা হয়েছিল। শীতকালে আকাশে মেঘ মানায় না। শীতের আকাশে থাকবে ঝকঝকে রোদ। আমি হাইকোর্টের সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটছি বলেই একজনের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। আমি লজ্জিত হয়ে কিছু বলার আগেই তিনি বললেন, মাফ করে দিয়েছি।

আকাশের দিকে তাকিয়ে যে মন-খারাপ ভাবটা হয়েছিল— ভদ্রলোকের এক কথায় সেই মন-খারাপ ভাব দূর হয়ে গেল। ইচ্ছে করছে হাত ধরে ভদ্রলোককে কোনো চায়ের দোকানে নিয়ে যাই। খানিকক্ষণ তাঁর সঙ্গে গল্প করি। ভদ্রলোক আমাকে সেই সুযোগও দিলেন না। গম্ভীর গলায় বললেন, আমি অনেকক্ষণ থেকেই দেখছি আপনি আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটছেন। সব ঠিকঠাক তো?

জি, সব ঠিকঠাক।

আমার বাবা রিটায়ার করার পর ঠিক আপনার মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটা অভ্যাস করলেন। ফুটপাতে হাঁটলেও একটা কথা ছিল— উনি রাস্তাও পার হতেন আকাশের দিকে তাকিয়ে। গত বৎসর রাস্তা পার হবার সময় অ্যাক্সিডেন্ট করেন। একটা ট্রাক এসে তাঁকে চ্যাপ্টা করে রেখে চলে যায়। অনেকদিন পর আবার আপনাকে দেখলাম আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে। এই অভ্যাস দূর করুন।

জি আচ্ছা, করব।

পথ চলবেন চোখ খোলা রেখে।

চোখ খোলা রাখলে মনের চোখ বন্ধ হয়ে যায়।

মনের চোখ বন্ধ থাকাই ভালো। আপনাকে কে যেন ডাকছে। ওই দেখুন গাড়ি?

আমি এগুলাম গাড়ির দিকে। গাড়িতে যিনি বসে আছে তাঁকে চিনতে পারছি না। বিদেশী মহিলা মনে হয়— তুরস্ক-টুরস্ক হবে। অস্বাভাবিক লম্বা টানা টানা চোখ। কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রঙ। লালচে চুল। বোরকা পরা। তবে বোরকার ভেতর থেকে মুখ বের হয়ে আছে। কালো বোরকার কারণেই বোধহয়

তরুণীকে এমন অস্বাভাবিক রূপবতী লাগছে। ভদ্রমহিলার সঙ্গে কোন ভাষায় কথা বলব ? ইংরেজি ? সর্বনাশ হয়েছে— মনে মনে বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ করে কথা বলা— শাস্তির মতো।

হিমু সাহেব।

ইয়েস ম্যাডাম।

কী করছেন ?

কিছু করছি না।

উঠে আসুন।

আমি ড্রাইভারের পাশে বসতে গেলাম, ভদ্রমহিলা ইশারা করলেন তাঁর সঙ্গে বসতে। আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না ? আমি মিতু।

আমার মুখ হাঁ হয়ে গেল। এই মেয়ে যে শুধু নিজের চেহারা পাল্টে ফেলেছে তাই না— গলার স্বরও পাল্টেছে। ভারি স্বর। ইংরেজিতে একেই বোধহয় বলে 'হাসকি ভয়েস'।

হিমু সাহেব!

জি।

আমি যে আপনার পেছনে স্পাই লাগিয়ে রেখেছি সেটা কি জানেন ?

জি না, জানি না।

স্পাই আছে। স্পাইয়ের কাজ হচ্ছে— আপনার ক্রিয়াকর্ম লক্ষ রাখা এবং আমাকে রিপোর্ট করা।

সে কি ঠিকমতো রিপোর্ট করছে ?

হুঁ করছে।

মিতু মুখের উপর বোরকা ফেলে দিল। গাড়ি মিরপুরের রাস্তা ধরে উড়ে চলছে। ব্যস্ত রাস্তা। এমন ব্যস্ত রাস্তায় ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালাতে সাহস লাগে। ড্রাইভারের মনে হয় সেই সাহসের কিঞ্চিৎ অভাব আছে। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, ঘনঘন কাশছে। আমি বললাম, আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

মিতু বলল, কোথাও যাচ্ছি না। ঘুরছি। অকারণে ঘোরার অভ্যাস শুধু আপনার থাকবে, অন্য কারোর থাকবে না এটা মনে করা ঠিক না। আপনার চেয়েও অনেক বিচিত্র মানুষ থাকতে পারে।

অবশ্যই পারে।

আমার স্পাই আপনার সম্বন্ধে কী বলল জানতে চান ?

জি না। আমার কৌতূহল কম।

আমার কৌতূহল কম না। আমার কৌতূহল অনেক বেশি— আমি এখন আপনার নাড়িনক্ষত্র জানি। হাসবেন না।

আমি কি একটা সিগারেট ধরাতে পারি?

পারেন।

আমি সিগারেট ধরালাম। মিতু বলল, আপনার এই বিচিত্র জীবনযাপনের উদ্দেশ্য কী?

কোনো উদ্দেশ্য নেই। অল্প ক'দিনের জন্যে পৃথিবীতে এসেছি, নিজের মতো করে বাস করতে চাই।

আপনি বিয়ে করেন নি?

জি না।

করবেন না?

বুঝতে পারছি না।

কাকে বিয়ে করবেন? রূপাকে?

আমি আবারো হাসলাম। মিতু কঠিন গলায় বলল, হাসবেন না। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি, জবাব দিন।

জানা থাকলে জবাব দিতাম। জবাব জানা নেই।

আপনি দেশের বাইরে কখনো গিয়েছেন?

জি না।

যেতে চান?

আমি চুপ করে রইলাম। মিতু বলল, চুপ করে থাকবেন না। এই প্রশ্নের জবাব নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে— যদি যেতে চান আমাকে বলুন, আমি আপনাকে সারা পৃথিবী ঘুরিয়ে দেখাব। মরুভূমি দেখবেন— তুন্দ্রা অঞ্চল দেখবেন।

শর্ত কী?

কিসের শর্ত?

অকারণে নিশ্চয়ই আপনি আমাকে এই সুযোগ দিচ্ছেন না। শর্ত নিশ্চয়ই আছে। সেই শর্তটা কী?

আমারও খুব ঘুরতে ইচ্ছে করে। একা একা ঘুরতে ভালো লাগে না। একজন সঙ্গী দরকার।

পাহারাদার ?

পাহারাদার না, সঙ্গী। বন্ধু। আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে। আমার কোনো বন্ধু নেই। বাবার মৃত্যুর পর আমি একা হয়ে যাব।

আপনার বাবা মারা যাবেন না— আমি পবিত্র মানুষ খুঁজে পেয়েছি।

সেই পবিত্র মানুষটি কে ?

আছে একজন।

সে কি রূপা ?

হ্যাঁ রূপা। কী করে ধরলেন ?

ইনট্যুশন ক্ষমতা শুধু যে আপনারই প্রবল তাই না— আমারও প্রবল।

তাই তো দেখছি।

আপনি একবার বলেছিলেন আপনার এক পরিচিত লোক আছে যে হারানো মানুষের সন্ধান দিতে পারে।

হ্যাঁ বলেছিলাম— চানখাঁরপুলে থাকে— করিম।

তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে চলুন তো।

এখন যাবেন ?

হ্যাঁ এখন যাব। তার ক্ষমতা কী দেখব। যদি সে সত্যি কিছু পারে তাহলে...

তাহলে কী ?

আমার একজন হারানো মানুষ আছে। তাকে খুঁজে পাওয়া যায় কি না দেখব।

চলুন যাই।

করিম তার ছাপড়ার ঘর থেকে বের হয়ে আনন্দে দাঁত বের করে ফেলল— আরে, হিমু ভাইজান আফনে ?

কেমন আছিস ?

ভালো আছি। আফনের দোয়া।

ব্যবসাপাতি কেমন হচ্ছে ?

ব্যবসা নাই বললেই হয়। কনটেকে একটা কাম করলাম— পুলা হারাইয়া গেছিল। পাঁচ হাজার টেকা কনটেক। বাইর কইরা দিলাম— এর পরে আর টেকা দেয় না। চইদ্দবার গেছি। কোনোবারে দেয় পঞ্চাশ, কোনোবারে কুড়ি.... শেষে এমন গাইল দিছি— বলছি— হারামির বাচ্চা, তোর মারে আমি...

চুপ চুপ।

ছরি ভাইজান, ছরি। মিসটেক হইছে— আপনের সাথে মেয়েছেলে আছে খিয়াল নাই। বোরকা পরা খালাম্মা— মাফ কইরা দিবেন। ছোটলোকের জাত— মুখের ভাষার নাই ঠিক...।

আমি মিতুর দিকে তাকালাম। বোরকার ফাঁক দিয়ে একদৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে করিমের দিকে। কিছুই বলছে না। আমি বললাম, একটা মেয়ে হারিয়ে গেছে। পলিন নাম। তার পেনসিল বক্সটা আমার সঙ্গে আছে। মেয়েটা কোথায় আছে বল।

বাক্সটা দেন দেহি আমার হাতে।

আমি পেনসিল বক্স তার হাতে দিলাম। বক্স হাতে নিয়েই করিম ফিরিয়ে দিয়ে বিরস গলায় বলল, হারাইছে কই! এই মেয়ে তার মার সাথেই আছে। মেয়ে ইশকুলে পড়ে। তার গালে পোড়া দাগ আছে। ভাইজান, ঠিক বলছি না ?

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।

মিতু বলল, পেনসিল বক্স হাতে নিয়েই বুঝে ফেললেন ?

জে।

কীভাবে ?

কীভাবে এইটা তো খালাম্মা জানি না। আল্লাহ্‌পাক একটা ক্ষমতা দিছে। এই ক্ষমতা বেইচ্যা খাই।

আমার একটা লোক খুঁজে দিতে পারবেন ?

জে পারব। অবশ্যই পারব। তয় খালাম্মা কনটেকে কাম করব। টেকা পুরাটা দিবেন এডভান্স। কাম করতে না পারলে গলায় ইটার মালা দিয়া কানে ধইরা শহরে চক্কর দেওয়াইবেন। করিমের এক কথা। যার খোঁজ চান— তার নাম দিবেন, ব্যবহারী জিনিস দিবেন। ছবি থাকলে ছবি দিবেন। বাকি আল্লাহর ইচ্ছা।

আচ্ছা, আমি আসব।

গাড়িতে উঠতে উঠতে বললাম, লোকটাকে কি আপনার বিশ্বাস হয়েছে ?

মিতু বলল, আপনার হয় ?

হ্যাঁ হয়। এই ক্ষমতা তার আছে। কীভাবে এই ক্ষমতা তার হয়েছে আমি জানি না। তবে হয়েছে। সে আপনার হারানো মানুষ খুঁজে দেবে। তবে...।

তবে কী ?

যে হারিয়ে গেছে তাকে হারিয়ে যেতে দেয়াই ভালো। হারানো মানুষকে খুঁজে বের করতে নেই।

মিতু বোধহয় কাঁদছে। বোরকায় মুখ ঢাকা বলে বুঝতে পারছি না। তবে তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে।

মিতু আমাকে আমার মেসবাড়ির সামনে নামিয়ে দিল। মুখের উপর থেকে বোরকার পরদা উঠিয়ে দিয়ে বলল, আপনি যদি আমার প্রস্তাবে রাজি থাকেন তাহলে আর হারানো মানুষ খুঁজব না। আপনি কি রাজি?

আমি বললাম, না।

না কেন?

আপনার আকর্ষণী ক্ষমতা প্রবল। রূপার চেয়ে প্রবল। আমাকে এর বাইতে থাকতেই হবে।

কেন?

আমার উপর এই হলো আদেশ।

কার আদেশ?

আমার বাবার। তিনি আমার নিয়তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মিতু যাই।

মিতু জবাব দিল না।



আপনার নাম কি মুনশি বদরুদ্দিন তালুকদার ?

জি।

ভালো আছেন ?

মুনশি বদরুদ্দিন জবাব দিলেন না, দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে হচ্ছে আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেয়ার তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। আমার সঙ্গে কথাবার্তাও চালাতে চাচ্ছেন না। তালগাছের মতো লম্বা একজন মানুষ। রোগা। ক্লান্ত ক্লান্ত চেহারা। নামের সঙ্গে মুনশি থাকার কারণে ক্ষীণ সন্দেহ থাকে, হয়তো তাঁর দাড়ি আছে। ভদ্রলোকের দাড়ি নেই। আমি বললাম, আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি ?

কেন ?

এমনি। কিছুক্ষণ কথা বলব ? কোনো কারণ নেই।

জমিজমা সংক্রান্ত কোনো কাজ ?

না। আমি আপনাকে বেশিক্ষণ বিরক্ত করব না। কিছুক্ষণ কথা বলে চলে যাব। আপনার ঠিকানা বের করতে আমার খুব কষ্ট হয়েছে। অফিস থেকে মালিবাগের একটা ঠিকানা দিয়েছিল— দেখা গেল ভুল ঠিকানা।

শুধু শুধু আমার সঙ্গে কথা বলতে চান কেন ?

শুনেছি আপনি ঘুস খান না। কাজেই আপনার সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ বোধ করছি।

ঘুস তো অনেকেই খায় না।

তাও ঠিক। সবার নাম ঠিকানা জানি না। জানলে সবার সঙ্গেই দেখা করতাম।

কেন ?

বারবার কেন কেন জিজ্ঞেস করবেন না তো ভাই— একটু বসতে দিন।

আমার মেয়ে খুব অসুস্থ। আপনি আরেকদিন আসুন।

তার কী অসুখ ?

বুকে ব্যথা।

আজই বুকে ব্যথা করছে, না অনেকদিনের রোগ ?

অনেকদিনের অসুখ।

আমি শারীরিক ব্যথা কমাতে পারি। মেয়েটার কাছে আমাকে নিয়ে চলুন।

মুনশি বদরুদ্দিনের মুখের মাংসপেশি সামান্যতমও শিথিল হলো না। বোঝাই যাচ্ছে এ কঠিন লোক। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে যে দাঁড়িয়েই আছে। এক মুহূর্তের জন্যেও দরজা থেকে হাত সরায় নি। আমি হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম, আচ্ছা ভাই যাই। আরেকদিন আসব।

সিঁড়ি দিয়ে প্রায় নেমে গেছি, তখন বদরুদ্দিন ডাকলেন, আসুন।

আমি ঘরে ঢুকলাম। একজন সৎ মানুষের বসার ঘর যেমন হওয়া উচিত, ঘরটি তেমন। এক কোনায় কয়েকটা কাঠের চেয়ার, অন্য কোনায় বড় চৌকি। অসুস্থ মেয়েটি এই চৌকিতেই শুয়ে আছে। ১৪-১৫ বছর বয়স। মায়া-মায়া মুখ। হাত-পা এলিয়ে শুয়ে আছে। তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। ব্যথায় ঠোঁট নীল। এই অবস্থায়ও সে আগ্রহ নিয়ে আমাকে দেখছে। আমি হাসলাম। সেও হাসার চেষ্টা করল। আমি সহজ গলায় বললাম, মেয়েটার মা কোথায় ?

দেশের বাড়িতে। বেতন যা পাই তাতে ফ্যামিলি নিয়ে ঢাকায় থাকা যায় না। আমি একটা ঘর সাবলেট নিয়ে একা থাকি।

এই মেয়েটি কি আপনার সঙ্গে থাকে ?

একে চিকিৎসার জন্যে নিয়ে এসেছিলাম।

চিকিৎসা হচ্ছে ?

বদরুদ্দিন চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, আপনার মেয়ের নাম কী ?

ওর নাম কুসুম।

আমি বসে আছি একটা চেয়ারে। বদরুদ্দিনের হাতে একটা গ্লাস এবং চামচ। গ্লাসে সম্ভবত শরবত জাতীয় কিছু আছে। তিনি চামচে করে মেয়ের মুখে শরবত দেয়ার চেষ্টা করছেন। মেয়েটা শরবত খেতে চাচ্ছে না। আমি বললাম, ভাই শুনুন, আপনার মেয়েটার মনে হয় খুব কষ্ট হচ্ছে। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে— চলুন মেয়েটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই।

না।

না কেন ?

আমি কারো দয়া নেই না।

দয়া বলছেন কেন ? বলুন সাহায্য।

আমি কারোর সাহায্যও নেই না।

শুনুন ভাই— এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে সাহায্য নিতে হয় এবং সাহায্য করতে হয়। Give and take.

আমি আপনাকে চিনি না, জানি না— কেন আপনি খামাখা বিরক্ত করছেন ?

মেয়েটা কষ্ট পাচ্ছে, আপনি তার কষ্ট কমাবার চেষ্টা করবেন না ?

আমি আমার সাধ্যমতো করেছি। যেটা আমার সাধ্যের বাইরে সেটা আমি করব না।

বদরুদ্দিন সাহেব— সততা একসময় রোগের মতো হয়ে দাঁড়ায়। সবসময় দেখা যায় সৎ মানুষরা ভয়ানক অহঙ্কারী হয়। এরা নিজেদেরকেই শুধু মানুষ মনে করে, অন্যদের করে না। আপনি নিজে যেমন কারোর সাহায্য নেন না— আমি নিশ্চিত, আপনি কাউকে সাহায্যও করেন না। করেছেন, কাউকে কোনো সাহায্য ?

আমি আমার নিজের মতো থাকি।

নিজের মতো থাকার জন্যে তো আপনাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয় নি।

আপনি কে ?

আমার নাম হিমু। বাইরে ঠাণ্ডা আছে। মেয়েটাকে একটা গরম কাপড় পরান। আমরা তাকে ভালো কোনো কোনো ক্লিনিকে নিয়ে যাব। আবার যদি না বলেন— তিনতলা থেকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেব।

অসুস্থ মেয়েটি তার বাবাকে চমকে দিয়ে খিলখিল করে হেসে ফেলল। আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম, কুসুম, তুমি কি আমার সঙ্গে হাসপাতালে যাবে ?

হুঁ।

তোমার ব্যথা কি এখন একটু কমেছে ?

হুঁ। আপনি কে ?

আমার নাম হিমু। ভালো নাম হিমালয়।

মেয়েটি আবারো হেসে উঠল। মনে হচ্ছে সে অতি অল্পতেই হেসে ফেলে।

বদরুদ্দিন গম্ভীর গলায় বললেন, হাসপাতালে কুসুমকে নিয়ে লাভ হবে না। ওর একটা অপারেশন দরকার। ডাক্তাররা বলছেন এই অপারেশন এখানে হয় না। আগে কখনো হয় নি।

আগে হয় নি বলে কোনোদিন হবে না তা তো না। এবার হবে। মেয়েটার গরম কাপড় নেই ?

বদরুদ্দিন লাল রঙের একটা সুয়েটার বের করে আনলেন। মেয়েটা আনন্দিত মুখে চুল আঁচড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে সে কোথাও বেড়াতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

তাঁকে একটা ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে দিলাম। বড় ক্লিনিক বলেই বোধহয় শুধু টাকারই খেলা। ভর্তি করাবার সময়ই সাতদিনের টাকা এডভান্স দিতে হয়। এই সঙ্গে ডাক্তার এবং ওষুধের বিল বাবদ দেড় হাজার টাকা।

পকেটে আছে দুটা কুড়ি টাকার নোট। একটা পাঁচ টাকার নোট। দ্রুত টাকার যোগাড় করতে হবে। জরুরি সময়ের একমাত্র ভরসা হচ্ছে রূপা। টেলিফোনে তাকে পাওয়া গেলে হয়। ক্লিনিকের রিসিপশান থেকে টেলিফোন করতে হলেও এডভান্স টাকা দিতে হয়। শহরের ভেতর প্রতি কল পাঁচ টাকা। মানুষের রোগ নিয়ে ব্যবসা কত প্রকার ও কী কী হতে পারে তা ক্লিনিকওয়ালাদের মতো ভালো কেউ জানে না।

হ্যালো রূপা ?

হুঁ।

কুকুরছানাটা যে পাঠিয়েছিলাম সে কেমন আছে ?

ভালো আছে।

পছন্দ হয়েছে তো ?

হ্যাঁ, পছন্দ হয়েছে। খুব পছন্দ হয়েছে। এটা কিন্তু নেড়ি কুকুর না। বিদেশী কুকুর— পুডল।

শুনে আনন্দি হলাম। এখন তুমি দয়া করে একটা কাজ করো— কুকুরের দাম বাবদ চার হাজার টাকা পাঠিয়ে দাও। আমি লোক পাঠাচ্ছি।

লোক পাঠাতে হবে না। তুমি কোথায় আছ বলো— আমি নিজেই টাকা নিয়ে আসছি। অনেকদিন তোমাকে দেখি না।

আমি ক্লিনিকের নাম বললাম। রূপা টেলিফোন নামিয়ে রাখল। রূপার এখানে আসতে আসতেও আধ ঘন্টার মতো লাগবে। এই ফাঁকে আমি সটকে পড়ব। রূপার সঙ্গে দেখা করতে চাই না।

কুসুমের জায়গা হয়েছে রুম নাম্বার ৮-এ। বেশ বড় রুম। টিভি পর্যন্ত আছে। কুসুম তার শরীরের তীব্র ব্যথা অগ্রাহ্য করে তার কেবিনের সাজসজ্জা দেখছে। তার চোখে গভীর বিস্ময়।

ডাক্তার সাহেব ব্যথা কমানোর ইনজেকশন দিয়েছেন। ডাক্তার সাহেবের মুখ শুকনো। মনে হচ্ছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি ইনজেকশনটা দিলেন। আমি বললাম, রোগী কেমন দেখছেন ডাক্তার সাহেব ?

তিনি রসকষহীন গলায় বললেন, বাইরে আসুন, বলছি।

আমরা বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ডাক্তার সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, আপনারা লস্ট কেইস নিয়ে এসেছেন। এই মেয়ের বাঁচার কোনো আশা নেই। এর হার্ট পুরোপুরি ড্যামেজড। এ যে কীভাবে বেঁচে আছে সেটাই একটা রহস্য।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, জগতটাই রহস্যময় ডাক্তার সাহেব। তবে আপনাকে একটা উপদেশ দেই। লস্ট কেইস ধরে নিয়ে কোনো রোগীর চিকিৎসা করবেন না। চিকিৎসকরা চিকিৎসা শুরু করবেন 'gain case' ধরে, 'lost case' ধরে না।

ভেবেছিলাম আমার কথায় ডাক্তার রাগ করবেন। তিনি রাগ করলেন না। চিন্তিত মুখে আবার মেয়েটির কাছে ফিরে গেলেন।

আমি মোটামুটি নিশ্চিত বোধ করছি। এই মেয়েটিকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। রূপা চলে আসছে। যা করার সে-ই করবে। টাকা না দিয়েই ক্লিনিক ছেড়ে চলে যাচ্ছি— এটা ক্লিনিকের লোকজন পছন্দ করছে না। একজন এসে টাকা দেবে— এই সত্য বিশ্বাস করতে তারা প্রস্তুত নয়। ম্যানেজার জাতীয় এক ভদ্রলোক বললেন, আপনি বসুন নারে ভাই। চা পানি খান। উনি আসলে চলে যাবেন। আমি বললাম, আমার কথার উপর ভরসা হচ্ছে না ?

ছিঃ ছিঃ কী বলেন, ভরসা হবে না কেন ?

জামিন হিসেবে একজন রোগী তো আছেই। টাকা-পয়সা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে ঝামেলা হলে ইনজেকশন দিয়ে রোগী মেরে ফেলবেন। গেল ফুরিয়ে। মামলা ডিসমিস।

আপনি অমানুষের মতো কথা বলছেন। আপনি তো একজন ক্রিমিনাল।

ঠিক বলেছেন। এখন দয়া করে অনুমতি দিন— আমাকে মুন্সীগঞ্জ যেতে হবে। মুন্সীগঞ্জের ওসি সাহেবের কাছে ধরা দিতে হবে। যেতে পারি ?

কেউ জবাব দিল না।

হাসপাতালের গেটের কাছে মুনশি বদরুদ্দিন দাঁড়িয়ে। তিনি আমাকে দেখলেন। কিছু বললেন না। মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মনে হচ্ছে তিনি আমাকে পছন্দ করছেন না।



মোহম্মদ রজব খোন্দকার থানায় ছিলেন না। থানার ভেতরেই তাঁর কোয়ার্টার। গেলাম কোয়ার্টারে। আশঙ্কা ছিল তিনি আমাকে চিনতে পারবেন না। অল্প কিছুক্ষণের পরিচয়। না পাবারই কথা। পুলিশদের স্মৃতি দুর্বল হয়। কিন্তু তিনি আমাকে চিনলেন, আনন্দিত গলায় বললেন— আরে দি গ্রেট হিমুবাবু।

চিনতে পেরেছেন ?

চিনব না মানে ? মাথা কামিয়ে গর্ত বানিয়ে বসে ছিলেন। আমি ধরে নিয়ে এলাম। এরপরেও চিনব না ? এখন করছেন কী ?

কিছু না।

হণ্টন চালিয়ে যাচ্ছেন ? শহরজুড়ে হাঁটাহাঁটির বদঅভ্যাস আছে এখনো ?

কয়েকদিন হলো হাঁটছি না। গাড়ি করে ঘুরছি—।

গাড়ি! গাড়ি কোথায় পেলেন ? চোরাই মাল ?

চোরাই মাল না।

অবশ্যই চোরাই মাল। ঢাকা শহরে যত গাড়ি আছে সব ব্ল্যাকমানির গাড়ি। তারপর বলুন হিমু সাহেব— আমার কাছে কী জন্যে ?

আপনি কেমন আছেন দেখতে এসেছি স্যার।

ভালো আছি। সুখে আছি। মিরপুরে জমি কিনেছি।

ঘুস খাওয়া ধরেছেন ?

অবশ্যই ধরেছি। সকাল বিকাল সন্ধ্যা তিন বেলা খাচ্ছি। কী ঠিক করেছি জানেন— আগামী পাঁচ বছর খাব। তারপর তওবা করব। ব্যস, আর না। বাকি জীবন আল্লাহ-খোদার নাম নিয়ে পার করে দেব। পাঁচ বছরের অপরাধ তিনি ক্ষমা করবেন। কারণ তিনি হচ্ছেন রহমানুর রহিম। কত কঠিন অপরাধ ক্ষমা করে দেন— ঘুস তো সেই তুলনায় কিছুই না।

স্যার, আপনার কাছে কলম আছে ?

কলম কী জন্যে ?

পবিত্র মানুষদের একটা লিস্ট করেছিলাম। সেখানে আপনার নাম ছিল— নামটা কেটে দেব।

পবিত্র মানুষদের লিস্ট ?

হুঁ।

নতুন কোনো পাগলামি ?

হুঁ।

গুড। ভেরি গুড। দু-একটা পাগল-ছাগল সংসারে না থাকলে ভালো লাগে না। হিমুবাবু!

জি স্যার ?

রাতে আমার সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করবেন। একজন একটা রুই মাছ দিয়ে গেছে, আট কেজি ওজন । নদীর ফ্রেশ মাছ। পোলাওয়ের চালের ভাত করতে বলেছি। পোলাওয়ের চালের ভাত, কাগজি লেবু আর মাছের পেটি। দেখি মাছ কত খেতে পারেন। মাছ খেতে পারেন তো ?

জি স্যার, পারি।

এখন সত্যি করে বলুন। আসলেই কি পবিত্র মানুষের লিস্ট আছে ?

আছে।

মুন্সীগঞ্জ এসেছেন আমার ব্যাপারে খোঁজখবর করবার জন্যে ?

জি।

হিমু সাহেব, পবিত্র মানুষের ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। এটা পাবেন না। আমি একজন পবিত্র মানুষকে জানতাম— আমার পিতা। অতি পবিত্র। স্কুলশিক্ষক ছিলেন— মধুর ব্যবহার। মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখলে স্থির থাকতে পারতেন না। লোকে বলত তাঁকে দেখলে দিনটা ভালো যায়। সেই লোক কী করত জানেন ? তাঁর কাজ ছিল— কাজের মেয়েদের প্রেগনেন্ট করে ফেলা। চারটা কাজের মেয়ে আমাদের বাসায় পর পর প্রেগনেন্ট হয়েছে। আমার মা এদের টাকা-পয়সা দিয়ে গ্রামে পার করে দিতেন। আর শুধু কাঁদতেন...। বুঝলেন হিমু সাহেব, পবিত্র মানুষ না হয়ে সাধারণ মানুষ হওয়াই ভালো।

রাতে ওসি সাহেবের বাসায় খেতে গেলাম। শাক, ডাল আর ডিমের তরকারি। অবাক হয়ে বললাম, রুই মাছের পেটি কোথায় ? আট কেজি রুই ?

ওসি সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, রুই মাছের পেটি পাব কোথায় ? বেতন যা পাই তা দিয়ে আট কেজি রুই একটাই কেনা যাবে। শুধু রুই মাছ কিনলে হবে ?

রুই মাছের কথাটা বললেন যে ?

একজন একটা রুই মাছ দিতে এসেছিল। হাত কচলে বলল, স্যার আট কেজি ওজন। এখন হারামজাদাকে আটবার কানে ধরে ওঠ-বোস করিয়ে বিদেয় করেছি।

মিরপুরে জমি কিনেছেন ?

কিনেছি। মা মারা গেছেন। মার জন্যে কবরের জায়গা কিনেছি।

আপনি তাহলে বদলান নি ওসি সাহেব!

বদলাব কেন ? আমি কি গুঁইসাপ যে ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলাব ? আমি হলাম গিয়ে মানুষ। খেতে পারছেন হিমু ?

জি স্যার, পারছি খেতে, খুব ভালো হয়েছে।

আপনার ভাবিকে একটু বলুন— গেস্টদের সে ভালোমন্দ খাওয়াতে পারে না, এই জন্যে তার মনটা থাকে খারাপ। কই, শুনে যাও তো...

ঘোমটা দেয়া একজন মহিলা জড়োসড়ো হয়ে দরজার পাশে দাঁড়ালেন। ওসি সাহেব বললেন, ললিতা, এ হলো গিয়ে হিমু। ডেঞ্জারাস ছেলে। একে জেল-হাজতে রেখে দেয়া উচিত। একে সভ্য সমাজে চলাফেরা করতে দেয়া উচিত না। যাই হোক, এ বলছে তোমার রান্না ভালো হয়েছে।

ললিতা স্বামীর কথার উত্তরে ফিসফিস করে কী যেন বললেন, ওসি সাহেব হো-হো করে হাসতে হাসতে বললেন, খবরদার এইসব কথা বলবে না। এইসব কথা শুনলে সে আবার ফট করে তোমার নাম পবিত্র মানুষদের লিস্টে তুলে ফেলবে। এ ভয়ঙ্কর ছেলে। লিস্টে নাম উঠে গেল ভয়ঙ্কর বিপদে পড়বে... হো-হো-হো। হা-হা-হা।

মুন্সীগঞ্জ থেকে ফেরার সময় ওসি সাহেব এক ডজন কলা কিনে দিলেন। মুন্সীগঞ্জের কলা নাকি বিখ্যাত। আমি স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই পা ছুঁয়ে সালাম করলাম। পবিত্র মানুষ স্পর্শ করলেও পুণ্য।

ওসি সাহেব আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। স্ত্রীকে হাসতে হাসতে বললেন, এই পাগলাটাকে একদিন রুই মাছ খাওয়াতে হবে।



বড় খালা সাধারণত দশটা বাজার আগেই ঘুমিয়ে পড়েন। এখন সাড়ে এগারটা বাজে। এত রাত পর্যন্ত তিনি কখনোই জাগেন না। আজ জেগে ছিলেন। কলিংবেল বাজতেই নিজে দরজা খুললেন। আমি বললাম, তুমি দোতলা থেকে নামলে কেন ? আর লোকজন কোথায় ?

বড় খালা কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, তোর খালুজান সেই যে গিয়েছে আর ফেরে নি। চারদিন হয়ে গেছে। টেলিফোন করে নি, অফিসেও যায় নি।

অফিসে যাবে কেন ? সেখানে তো শুনেছি চাকরি নেই।

চাকরি যাওয়া এত সোজা ? ওকে ছাড়া অফিস চলবে ? ও একা যত কাজ করে অফিসের পুরো স্টাফ তা করে না।

তবু অফিসে বসে মদ্যপান।

অফিসে চা খেলে দোষ হয় না, আর একটু-আধটু ইয়ে খেলে দোষ হয়ে গেল ?

একটু-আধটু না খালা, গ্যালন গ্যালন...

চুপ কর।

বড় খালার মুখ কাঁদো-কাঁদো। মনে হয় কাঁদছিলেন। তাঁর পরিবর্তন বিস্ময়কর। আমি বললাম, খালুজান ছাড়াও তো ঘরে লোকজন ছিল। তারা কোথায় ?

কাজের লোকজনের কথা বলছিস ? সব বিদেয় করে দিয়েছি। অসহ্য হয়েছে।

এখন একা থাক ?

কী বোকার মতো কথা বলছিস ? দোকা আমি পাব কোথায় ?

রাতে ভয় লাগে না ? এত বড় বাড়ি একা একা থাক...

ভয় তো লাগবেই। ভয়ের জন্যেই তো জেগে ছিলাম। দুটা সিডাকসিন খেয়েছি, তারপরেও ঘুম আসছে না।

আরো দুটা খাও। আজকাল সিভাকসিনেও ভেজাল। ঘুম আসার বদলে ঘুম চলে যায়।

রাতদুপুরে ফাজলামি করিস না তো।

ফাজলামি করছি না খালা। আমি সিরিয়াস। আমার মনে হয় না একা একা তোমার এত বড় একটা বাড়িতে থাকা উচিত। শেষে ভূত-টুত কিছু একটা দেখে বাথরুমে দাঁত কপাটি লেগে পড়ে থাকবে। খালা, তুমি বরং কোনো আত্মীয়স্বজনের বাসায় চলে যাও। বাড়িতে বিরাট তালা লাগিয়ে দাও।

আমি অন্যের বাসায় গিয়ে উঠি, আর তোর খালু ফিরে এসে দেখুক বাড়িতে কেউ নেই, তালা ঝুলছে। আজগুবি উপদেশ দিতে তোকে কে বলছে ?

তাহলে বরং এইখানেই থাক, এবং একা একা থাক। একা একা থাকা অভ্যাস হবারও দরকার আছে। খালুজান তোমার দশ বছরের বড়। সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চললে তিনি বিদেয় হবেন তোমার দশ বছর আগে। খুব কম করে হলেও তোমাকে দশ বছর থাকতে হবে একা একা। মেয়েরা আবার শুনেছি পুরুষদের চেয়ে বেশিদিন বাঁচে। এমনিতে নাকি শারীরিকভাবে দুর্বল। বাঁচার সময় আবার বেশিদিন বাঁচছে— কোনো মানে হয় ?

তুই ক্রমাগত আজেবাজে কথা বলে যাচ্ছিস কেন ?

চলে যাব ?

চলে যা।

আর ধর, হঠাৎ যদি পথেঘাটে খালুজানের দেখা পেয়ে যাই তাহলে কী করব ? ধরে নিয়ে আসব ? আমি তো পথে পথেই ঘুরি। আমার জন্যে দেখা পাওয়াটা সহজ।

কাউকে আনতে হবে না। নিজ থেকে এলে আসবে, না এলে নাই।

তাহলে আমি বিদেয় হই খালা। তুমি দরজা-টরজা লাগিয়ে জেগে বসে থাক।

রাতে কিছু খেয়েছিস ?

খেয়েছি।

শুধু মুখে যাবি কেন ? হালুয়া খেয়ে যা।

হালুয়া আমি খাই না।

ভালো হালুয়া। পেঁপের হালুয়া।

পেঁপের আবার হালুয়া হয় নাকি ?

হয়। খেতে মোরব্বার মতো লাগে। তোর খালুজান খুব পছন্দ করে খায়।

তুমি কি এখন রাত জেগে জেগে খালুজানের সব পছন্দের খাবার বানাও ?

গাধার মতো কথা বলবি না। ঘরে পেঁপে ছিল। নষ্ট হচ্ছিল, হালুয়া বানিয়ে রেখে দিয়েছি— খাবি ? এনে দেই পিরিচে করে ?

উঁহুঁ, তুমি বরং পলিথিনের ব্যাগে করে খানিকটা দিয়ে দাও। মাঝরাতে খিদে পেলে তখন খেয়ে নেব।

বড় খালা আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। আমি বললাম, তোমার যদি একা থাকতে ভয় লাগে তাহলে মুখ ফুটে বলো আমি থেকে যাব।

কাউকে থাকতে হবে না। আর তুই ঠিকই বলেছিস, একা একা থাকার অভ্যাস তো করতেই হবে।

যাই খালা ?

যা। আর শোন, তুই তো পথে পথেই ঘুরিস। একটু চোখকান খোলা রাখিস। তোর খালুজানকে দেখলে...

অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসব ?

নিয়ে আসতে হবে না। লুকিয়ে লুকিয়ে পেছনে পেছনে যাবি, কোথায় থাকে জেনে আসবি, তারপর আমি গিয়ে ধরব।

এটা মন্দ না। খালা যাই।

যা। ভালো কথা, তুই নাকি পবিত্র মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছিস ?

কে বলল ?

কে বলেছে খেয়াল নেই। তুই নাকি কী একটা লিস্ট বানিয়েছিস ?

হুঁ।

কী করবি পবিত্র মানুষ দিয়ে ?

চিড়িয়াখানায় রাখা যায় কি না সেই চেষ্টা করব। পবিত্র মানুষ বলতে গেলে রেয়ার স্পেসিস হয়ে গেছে। দুর্লভ প্রাণী, চীনের পাণ্ডার মতো...

সবসময় সবার সঙ্গে রসিকতা করিস না হিমু। মা-খালাদের সঙ্গে রসিকতা করা যায় না।

আর করব না।

পবিত্র মানুষ পেয়েছিস খুঁজে ?

একটা প্রিলিমিনারি লিস্ট তৈরি করেছি। এর মধ্যে বাছাই হচ্ছে...। সেমিফাইনালে চলে এসেছি...।

বড় খালা লজ্জিত গলায় বললেন, তোর খালুজানের নাম কি লিস্টিতে আছে ?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, তুমি কি চাও তার নাম লিস্টিতে থাকুক ?

হুঁ। একজন স্ত্রীর পক্ষেই সম্ভব তার স্বামীকে পুরোপুরি জানা... আমি তাকে যতটুকু জানি তার নাম থাকা উচিত। হাসছিস কেন ?

বড় খালুর নাম লিস্টিতে আছে। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার কী জানো, তোমার নামও লিস্টিতে আছে।

সত্যি বলছিস ?

কাগজটা পকেটে আছে। দেখতে চাও ?

না। তোর কথা বিশ্বাস করছি। এত বড় সম্মান এর আগে আমাকে কেউ দেয় নি রে হিমু।

বড় খালা চোখ মুছতে লাগলেন।

মেসে ফিরে এসেছি। আমি শুয়েছি মেঝেতে পাটি পেতে। খালুজান খাটে বসে অন্ধকারে পেঁপের হালুয়া খাচ্ছেন।

আজ একটু শীত পড়েছে। পাটিতে শুয়ে শীত-শীত লাগছে। হিমালয়ের গুহায় সাধু-সন্ন্যাসীরা নেংটি পরে কীভাবে থাকেন কে জানে ? টেকনিকটা তাঁদের কাছে শিখে এসে আমাদের দেশের ফুটপাতের মানুষগুলোকে শিখিয়ে দিতে পারলে কাজ হতো। তারা পৌষমাসের নিদারুণ শীত হাসিমুখে পার করে দিতে পারত।

খাটের উপর থেকে বড় খালু ডাকলেন, হিমু!

আমি কিছু বললাম না, তবে নড়াচড়া করলাম যাতে তিনি বুঝতে পারেন আমি জেগে আছি।

পেঁপের হালুয়াটা তো অসাধারণ হয়েছে— চেখে দেখবি ?

না।

জিনিসটা পুষ্টিকর। পেটের জন্যেও ভালো।

আমার পেট ভালোই আছে। আমি খান পেট ঠিক করুন।

তোর বড় খালার অবস্থা কী দেখলি ? আমার জন্যে খুব ব্যস্ত ?

না।

সে কী! কিছুই বলে নি ?

না।

মুখে না বললেও মনে মনে খুবই ব্যস্ত। পেঁপের হালুয়া-টালুয়া বানাচ্ছে দেখছিস না ?

পেঁপে পচে যাচ্ছিল। হালুয়া বানিয়ে ফ্রিজে রেখে দিয়েছে।

এইসব তুই বুঝবি না। বিয়ে করিস নি তো, বুঝবি কীভাবে ? আমি তো বলতে গেলে একটা থার্ডক্লাস লোক। সেই আমার জন্যে তার টান...

ঘুমান খালুজান।

অসাধারণ একজন মহিলা।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, অসাধারণের কী দেখলেন ? তাঁর ঝগড়া করার ক্ষমতাকে যদি অসাধারণ বলেন তাহলে ভিন্ন কথা। বাসায় গিয়ে দেখি তিনি একা, কাজের সব কটা মানুষ বিদেয় করে দিয়েছেন।

উপরে উপরে দেখে তুই কিছু বুঝবি না। উপরে উপরে দেখলে তাকে ঝগড়াটে মনে হবে। কিন্তু ব্যাপার ভিন্ন। শুনবি ?

না, ঘুম পাচ্ছে ?

ইয়াং ম্যান, বারটা বাজতেই ঘুমিয়ে পড়বি এটা কেমন কথা। শোন্ না— তোর বড় খালা করে কী, অবিবাহিতা যুবতী সব মেয়ে রাখে কাজের মেয়ে হিসেবে। তোর খালার যুক্তি হচ্ছে, এই জাতীয় মেয়েগুলোকে কেউ রাখতে চায় না। এরা কাজ পায় না। শেষটায় দুষ্ট লোকের হাতে পড়ে। শুনছিস আমার কথা, না ঘুমিয়ে পড়েছিস ?

শুনছি।

তারপর তোর খালা খোঁজখবর করে এদের বিয়ে দেয়। প্রচুর খরচপাতি করে।

ছেলে পায় কোথায় ?

যোগাড় করে। টাকা দিয়ে কিনে নেয় বলতে পারিস। কাউকে রিকশা কিনে দেয়। কাউকে পান-বিড়ির দোকান দিয়ে দেয়... কাউকে চাকরি দিয়ে দেয়। এই পর্যন্ত আটটা মেয়ে পার করেছে।

এই ব্যাপারটা জানতাম না।

বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না রে হিমু। কিছুই বোঝা যায় না। ডাবের শক্ত খোসা দেখে কে বলবে ভেতরে টলটলে পানি ? তুই এক কাজ কর রে হিমু, তোর ঐ লিস্টিতে তোর খালার নামটা তুলে দে...।

আচ্ছা দেব। আপনি ঘুমান।

ঘুম আসছে না।

বড় খালার কাছে যেতে চান ?

তুই কি মনে করিস যাব ? তুই যা বলবি তাই করব।

তাহলে ঘুমিয়ে পড়ুন।

একটু আগে না বললাম, ঘুম আসছে না।

তাহলে উঠে শার্ট গায়ে দিন। চলুন দিয়ে আসি।

আমাকে দেখে রাতদুপুরে আবার হইচই শুরু করে কি না। আল্লাহ যা একটা মেজাজ এই মহিলাকে দিয়েছে।

ভয় লাগলে থাক। দিনেরবেলায় যাওয়া যাবে।

বড় খালু উঠে বাতি জ্বালালেন। শার্ট গায়ে দিলেন। আনন্দিত গলায় বললেন, রাত তেমন বেশি হয় নি, তাছাড়া চাঁদনি পসর রাত।

বড় খালুকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে মনে হলো— এখন আর নিজের ঘরে ফিরে যাবার কোনো মানে হয় না। বরং মুনশি বদরুদ্দিনের মেয়েটাকে দেখে আসা যাক। তার ব্যবস্থা কী হয়েছে জেনে আসি। রূপার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে না। সে এতক্ষণ বসে থাকবে না।

ক্লিনিকের গেটের কাছে আমার ড্রাইভার ছামছু চিন্তিত মুখে হাঁটাহাঁটি করছে। তার এতক্ষণ এখানে থাকার কথা না। রাত এগারটার পর তার ছুটি হয়ে যায়। সে চলে যায় ইয়াকুব আলি সাহেবের বাড়ি।

ছামছু আমাকে দেখে ছুটে এলো। মনে হচ্ছে সে হাতে চাঁদ পেয়েছে।

কী ব্যাপার ছামছু? বাড়ি যাও নি?

গিয়েছিলাম স্যার আপনার জন্য আসছি।

বলো কী ব্যাপার?

বাড়িতে গিয়ে দেখি বড় স্যারের অবস্থা খুব খারাপ। ডাক্তাররা রক্ত দিবেন কিন্তু স্যার আপনার আনা রক্ত ছাড়া অন্য রক্ত নিবেন না। আপনাকে স্যার সবাই পাগলের মতো খুঁজতেছে।

তাই নাকি?

জি স্যার। ম্যানেজার সাহেব আপনার মেসে বসে আছেন। স্যার দেরি করবেন না, চলেন। এক্ষণ চলেন।

এত ব্যস্ত হলে তো চলবে না ছামছু। খালি হাতে উপস্থিত হলে কোনো লাভ নেই। রক্ত নিয়ে উপস্থিত হতে হবে। আমি রক্তের ব্যবস্থা করি।

যা করার একটু তাড়াতাড়ি করেন স্যার।

আমি ক্লিনিকে ঢুকলাম। লবিতে রূপা বসে আছে। শুধু একটিমাত্র মেয়ের কারণে পুরো লবি আলো হয়ে আছে। মানুষের শরীর হলো তার মনের আয়না।

একজন পবিত্র মানুষের পবিত্রতা তার শরীরে অবশ্যই পড়বে। সে হবে আলোর মতো। আলো যেমন চারপাশকে আলোকিত করে, একজন পবিত্র মানুষও তার চারপাশের মানুষদের আলোকিত করে তুলবে।

রূপা!

রূপা চমকে তাকাল। আমি হালকা গলায় বললাম, তুমি এখনো ক্লিনিকে, ব্যাপার কী?

রূপা বিরক্ত মুখে বলল, তুমি কী যে ঝামেলা তৈরি করো। বসে না থেকে আমি করব কী? মেয়েটার তো অবস্থা খুব খারাপ। আমি এসে দেখি এখন মারা যায়, এখন মারা যায় অবস্থা। অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে। এত বড় ক্লিনিক কিন্তু কোনো স্পেশালিস্ট ডাক্তার নেই— কিচ্ছু নেই...

তুমি ডাক্তার যোগাড়ে লেগে গেলে?

এ ছাড়া কী করব?

যোগাড় হয়েছে?

হয়েছে— ডাক্তাররা একটা বোর্ডের মতো করেছেন। বোর্ড মিটিং বসিয়েছেন। মেয়েটাকে মনে হয় দেশের বাইরে নিতে হবে।

আমি হাসলাম।

রূপা রাগী গলায় বলর, হাসছ কেন?

আচ্ছা যাও আর হাসব না। আজ যে পূর্ণিমা সেটা জানো?

না জানি না। অমাবস্যা-পূর্ণিমার হিসাব আমি রাখি না।

পূর্ণিমায় তোমার সঙ্গে জয়দেবপুরের বাড়িতে যাবার কথা ছিল ভুলে গেছ?

হ্যাঁ ভুলে গেছি। তোমার কোনো কথায় আমি কোনো গুরুত্ব দেই না। রাগ করলে?

না রাগ করি নি।

তুমি কি সত্যি সত্যি জয়দেবপুর যেতে চাও?

হুঁ।

হুঁ না স্পষ্ট করে বলো।

যেতে চাই।

মেয়েটাকে মরণের মুখোমুখি ফেলে রেখো তোমার সঙ্গে জোছনা দেখতে যাব?

হ্যাঁ। কারণ তুমি এখানে থেকে কিছু করতে পারবে না। তুমি ডাক্তার নও। তুমি যা করার করেছ। তারচেয়েও বড় কথা— মেয়েটা বেঁচে যাবে।

তোমার সেই বিখ্যাত ইনট্যুশন বলছে মেয়েটা বেঁচে যাবে ?

হু।

নিজেকে কী ভাবো তুমি ? মহাপুরুষ ?

আমি হাসলাম। রূপা ভুরু কুঁচকে বলল, তোমার বিখ্যাত ইনট্যুশন আর কী বলছে ?

আমার বিখ্যাত ইনট্যুশন বলছে— তুমি আমার সঙ্গে আজ জোছনা দেখতে যাবে। চল আর দেরি করা ঠিক হবে না।

আমাকে বাসা হয়ে যেতে হবে। বাসায় বলতে হবে। কাপড় বদলাতে হবে। তোমার সঙ্গে যাচ্ছি সুন্দর একটা কাপড় পরব না ?

যা তুমি পরে আছ তারচে' সুন্দর আর কোনো পোশাক এ পৃথিবীতে তৈরি হয় নি। তাছাড়া— পথে আমরা কিছুক্ষণের জন্যে থামব।

রূপা বিস্মিত হয়ে বলল, পথে থামব মানে ? পথে কোথায় থামব ?

মিনিট দশেকের জন্যে থামব।

তুমি তাহলে সত্যি সত্যি যাচ্ছ আমার সঙ্গে ? আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না।

রূপা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। মনে হয় সে কেঁদে ফেলেছে।



ইয়াকুব সাহেবের অবস্থা শোচনীয়। তাঁর চোখ বন্ধ। হাত থরথর করে কাঁপছে। ঠোঁটে ফেনা জমছে। একজন নার্স ভেজা রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছিয়ে দিচ্ছে। নার্স মেয়েটি খুব ভয় পেয়েছে। তবে যে দুজন ডাক্তার উনার দুপাশে দাঁড়িয়ে তারা শান্ত। তাঁদের চোখেমুখে উদ্বেগের ছাপ নেই।

মিতু বাবার হাত ধরে বসে আছে। কী শান্ত, কী পবিত্র দেখাচ্ছে মেয়েটাকে! আজ তার মাথায় 'উইগ' নেই। এই প্রথম দেখলাম তার মাথার চুল ছেলেদের মতো ছোট ছোট করে কাটা। ছোট চুলের জন্য মিতুর চেহারায় কিশোর কিশোর ভাব চলে এসেছে। সে পূর্ণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখল। কোমল গলায় বলল, বাবা, হিমু এসেছেন। তাকাও, তাকিয়ে দেখ।

ইয়াকুব সাহেব অনেক কষ্টে তাকালেন। অস্পষ্ট গলায় বললেন, এনেছ ?

জি স্যার।

তুমি নিশ্চিত যাকে এনেছ সে কোনো পাপ করে নি ?

জি নিশ্চিত।

কোথায় সে ?

গাড়িতে বসে আছে।

গাড়িতে কেন ? নিয়ে আসো।

নিয়ে আসা যাবে না। নিয়ে আসার আগে আপনার সঙ্গে টার্মস এন্ড কন্ডিশানস সেটল করতে হবে।

ইয়াকুব সাহেব অবাক হয়ে বললেন, কিসের কথা বলছ ?

আমি শান্তস্বরে বললাম, স্যার ব্যাপারটা হচ্ছে কী পবিত্র রক্ত যে পাত্রে ধারণ করবেন সেই পাত্রটাও পবিত্র হতে হবে। নয়তো এই রক্ত কাজ করবে না।

আমাকে কী করতে হবে ?

আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললাম, এই জীবনে আপনি যা কিছু সঞ্চয় করেছেন— বাড়ি-গাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি, টাকা-পয়সা সব দান করে নিঃস্ব হয়ে

যেতে হবে। পৃথিবীতে আসার সময় যেমন নিঃস্ব অবস্থায় এসেছিলেন ঠিক সে রকম নিঃস্ব হবার পরই পবিত্র রক্ত আপনার শরীরে কাজ করবে। তার আগে নয়।

এসব তুমি কী বলছ?

যা সত্যি তাই বলছি। স্যার আপনাকে চিন্তা করার সময় দিচ্ছি। আজ সারারাত ভাবুন। যদি মনে করেন হ্যাঁ রক্ত আপনি নেবেন তাহলে উকিল ব্যারিস্টার ডেকে দলিল তৈরি করে আমাকে খবর দেবেন। আমি জয়দেবপুরে আপনার ডাকের জন্যে অপেক্ষা করব। আমি ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি।

ইয়াকুব সাহেব স্থিরচোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি তাঁকে অভয় দেয়ার মতো করে হাসলাম। শান্তস্বরে বললাম, আপনার জন্যে কঠিন কাজটা করা হয়েছে। পবিত্র মানুষ যোগাড় হয়েছে। আমার ধারণা বাকি কাজটা খুব সহজ।

ইয়াকুব সাহেব এখনো আগের ভঙ্গিতেই তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখে পলক পড়ছে না। অবিকল পলকহীন পাখিদের চোখ।

স্যার, এখন আমি যাই?

ইয়াকুব সাহেব কিছু বললেন না। মনে হচ্ছে তাঁর চিন্তার শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। মিতু বলল, আপনি যাবেন না। আপনি এখানে অপেক্ষা করবেন। আমি উকিল আনাচ্ছি। দলিল তৈরি হবে।

ইয়াকুব সাহেব বললেন, না। দরকার নেই।

মিতু বলল, তুমি চুপ করে থাক বাবা। যে খেলা তুমি শুরু করেছ, তোমাকেই তা শেষ করতে হবে। পবিত্র রক্তের ক্ষমতা আমি পরীক্ষা করব।

না মিতু, না। আমি সবকিছু বিলিয়ে দেব? এটা কোনো কথা হলো?

আমার জন্যে তুমি কিছু চিন্তা করবে না। এই পৃথিবীতে আমার কোনো কিছুই চাইবার নেই। ডাক্তার সাহেব, আপনারা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকবেন না। ব্লাড ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করুন।

গাড়ি ছুটে চলেছে। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। রূপা জানালা খুলে রেখেছে। হু-হু করে গাড়িতে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে। রূপা গাড়ির জানালায় মুখ রেখে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে।

আমার ক্ষীণ সন্দেহ হলো— সে বোধহয় কাঁদছে।

আমি বললাম, রূপা তুমি কাঁদছ নাকি?

রূপা বলল, হ্যাঁ।

কাঁদছ কেন ?

রূপা ফোঁপাতে ফুঁপাতে বলল, জানি না কেন কাঁদছি।

গাড়ির জানালার ফাঁক দিয়ে এক টুকরো জোছনা এসে পড়েছে রূপার কোলে। মনে হচ্ছে শাড়ির আঁচলে জোছনা বেঁধে রূপা যেন অনেক দূরের কোনো দেশে যাচ্ছে। এই সময় আমার মধ্যে এক ধরনের বিভ্রম তৈরি হলো— আমার মনে হলো রূপা নয়, আমার পাশে মিতু বসে আছে। রূপা কাঁদছে না, কাঁদছে মিতু। জোছনার এই হলো সমস্যা— শুধু বিভ্রম তৈরি করে। কিংবা কে জানে এটা হয়তো বিভ্রম নয়। এটাই সত্যি। পৃথিবীর সব নারীই রূপা এবং সব পুরুষই হিমু।

—



Parapar by Humayun Ahmed

